মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা

”বেশি-বেশি বই পড়ুন

আলোকিত জীবন গড়ুন”

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

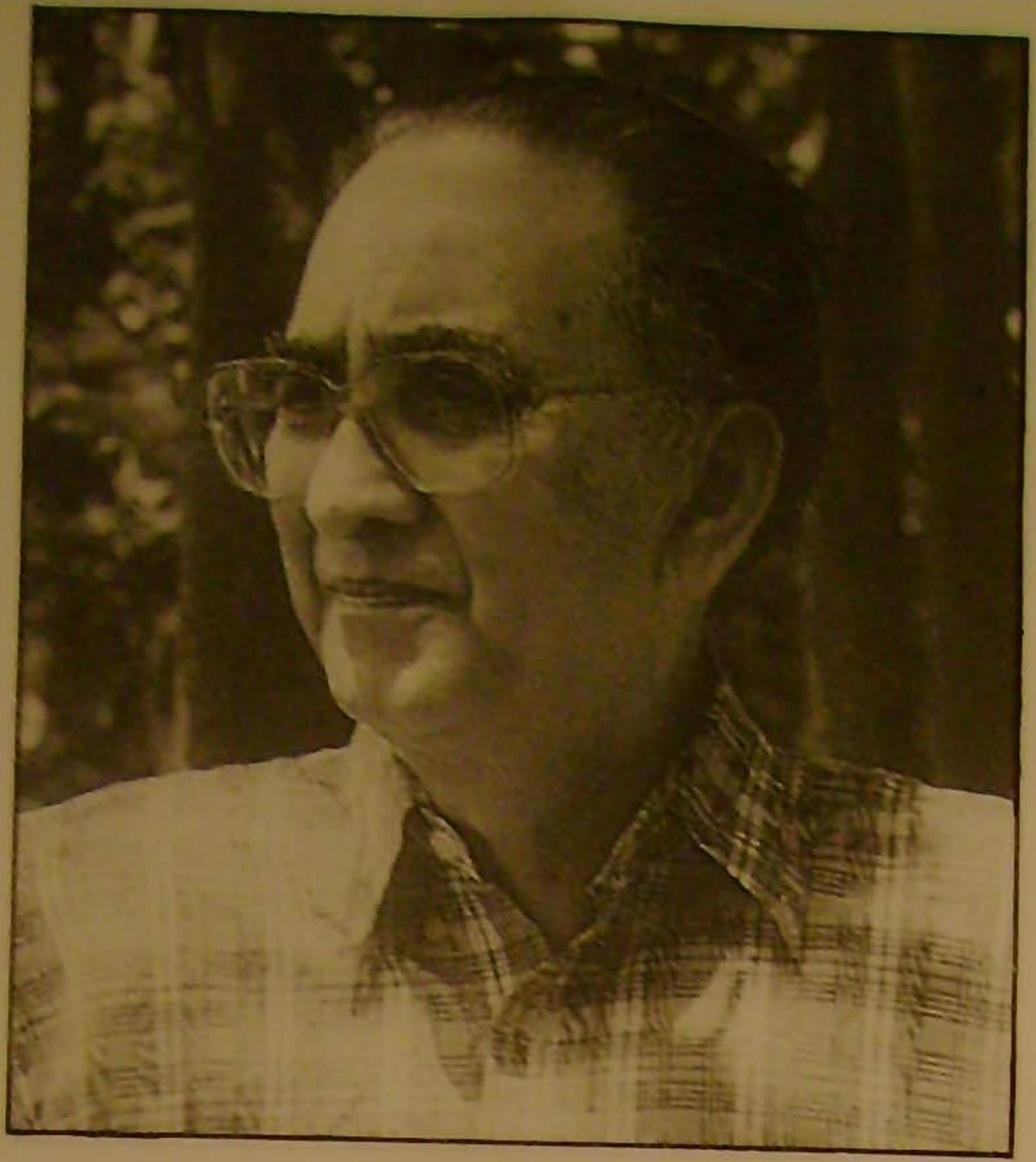

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

এ পর্যন্ত মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। বাংলা গ্রন্থগুলো— যথাশব্দ (১৯৭৪), রবীন্দ্রপ্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার (১৯৮৩), মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৩), কোরানসূত্র (১৯৮৪), গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ (১৯৮৫) বচন ও প্রবচন (১৯৮৫), রবীন্দ্ররচনার রবীন্দ্রব্যাখ্যা (১৯৮৬), রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য (১৯৮৬), আমরা কি যাবো না তাদের কাছে যারা শুধু বাংলায় কথা বলে (১৯৯৬), বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক (১৯৯৬), তেরই ভাদ্র শীতের জন্ম (১৯৯৬), কলম এখন নাগালের বাইরে (১৯৯৬), আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (১৯৯৭), বাংলাদেশে সংবিধানের শব্দ ও খণ্ডবাক্য (১৯৯৭), বাংলাদেশের তারিখ (১৯৯৮), মনের আগাছা পুড়িয়ে (১৯৯৮), বং বঙ্গ বাঙ্গালা বাংলাদেশ (১৯৯৯), সরকার সংবিধান ও অধিকার (১৯৯৯), কবি তুমি নহ গুরুদেব (১৯৯৯), একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয় (১৯৯৯), মৌসুমি ভাবনা (১৯৯৯), মিত্রাক্ষর (২০০০), জাগো ওঠো দাঁড়াও বাংলাদেশ (২০০০), নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০০০), কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ (২০০০), চাওয়া-পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসেব (২০০১), স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ও বোবার স্বপ্ন (২০০২), রবীন্দ্ররচনায় আইনি ভাবনা (২০০২), বিষণ্ন বিষয় ও বাংলাদেশ (২০০৩), প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে (২০০৪), রবীন্দ্রনাথ ও সভ্যতার সংকট (২০০৪), সাফদেলের মহড়া (২০০৪), দায়মুক্তি (২০০৫), উন্নত মম শির (২০০৫)।

বিদেশীরা বাঙালির সমালোচনা করেছেন। বাঙালিরাও আত্মসমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সব চেয়ে বাঙালির কঠিন সমালোচক। আত্মসমালোচনায় কর্তব্য শেষ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে 'প্রসঙ্গ কথা'-য় বলেন, 'কবুল করিতে হইবে আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য-বশত লজ্জাবোধও আমাদের নেই, কিন্তু সেই অপরাধ খণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়লোকদের ওপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামি শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা।'

১৩৩৪ সালের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ বাঙালির উপর আস্থা রেখে বলেন 'বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবন ধর্ম কখনোই চিরদিন ধার করা বার্ধক্যের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না।'

১৩৩১ সালে ছাত্রদের এক অভিনন্দন- সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করিবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাকিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি।'

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক
প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১১
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বাংলাবাজার কমপিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড তৃতীয় তলা
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

দাম
একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 431 9

AKJON BHARATIO BANGALIR ATASAMALOCHONA (Self-Criticism of an Indian Bengali) : by Muhammad Habibur Rahman. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Design by Qayyum Chowdhury. Price : Taka One Hundred Forty Only.

উৎসর্গ

স্নেহের ফরিদা রহমান
ও
মাহফুজুর রহমানকে

ভূমিকা

বিদেশীরা বাঙালির সমালোচনা করেছেন। বাঙালিরাও আত্মসমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালির সবচেয়ে কঠিন সমালোচক। আত্মসমালোচনার কর্তব্য শেষ নয়। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে 'প্রসঙ্গ কথা'য় বলেন, 'কবুল করিতে হইবে আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য-বশত লজ্জাবোধও আমাদের নাই, কিন্তু সেই অপরাধ খণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়লোকদের ওপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামি শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা।' ১৩৩৪ সালের 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এ বাঙালির ওপর রবীন্দ্রনাথ আস্থা রেখে বলেন, 'বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবন ধর্ম কখনোই চিরদিন ধার করা বার্ধক্যের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না।' ১৩৩১ সালে ছাত্রদের এক অভিনন্দন-সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করিবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাকিলে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি।'

যে-সৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একাত্মতাবোধ করতেন, সে-সম্পর্কে তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এক চিঠিতে লেখেন : 'আমি সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে এক সঙ্গে আছি এই কথাটা এক এক শুভমুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্টসুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হর্ষে আমার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে, ইহা আমার স্বভাব।'

১৩৩০ সালে বাঙালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভাপতির অভিভাষণে' বললেন, 'বাঙালিকে নেশন বলা যায় না, কেননা বাঙালি এখনো আপন রাষ্ট্রীয় ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেনি। অপর দিকে সামাজিক ধর্ম-সম্প্রদায়গত ঐক্যের মধ্যেও বিশেষ দেশের অধিবাসী আত্মপরিচয় দিতে পারে; যেমন, বলতে পারে, আমরা হিন্দু বা মুসলমান। কিন্তু বলাবাহুল্য, এ সম্বন্ধেও বাংলায় অনৈক্য রয়েছে। তেমনি বর্ণভেদ হিসাবে যে-জাতি সেখানেও বাংলায় ভেদের অন্ত নেই। তার পরে বিজ্ঞানবাদ-অনুসারে বংশগত যে-জাতি তার নির্ণয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানুষের দৈর্ঘ্য, বর্ণ, নাকের উচ্চতা, মাথার বেড় প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যের মাপজোখ করে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে-হিসাবে আমরা বাঙালিরা যে কোন বংশে জন্মেছি, পণ্ডিতের মত নিয়ে তা ভাবতে গেলে দিশেহারা হয়ে যেতে হবে।

জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি। এই প্রকাশের পূর্ণতা জীবনের পূর্ণতা। রোগতাপ দুর্বলতা অনশন প্রভৃতি বাধা কাটিয়ে যতই সম্পূর্ণরূপে জীবধর্ম পালন করতে পারি ততই আমার জৈব ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আমার এই জৈব-প্রকাশের আধার হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি।

কিন্তু, জল-স্থল-আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে-প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।

তাই বলছি, বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়; বাংলাভাষার ভেতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি।'

বাংলাভাষা পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাব পুনরুক্তি করে বলেন, 'এত কাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলি।'

রবীন্দ্রনাথ বাংলার বন্দনা করলেও ভারত তাঁর কাছে তীর্থভূমির মতো, এক মহাজাতির নাম। তিনি ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করিনি। বাংলাদেশের ছোট ঘরে আমার গর্ব করার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড় ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।' "নিজেদেরকে 'বাংলাজাতি' বলে উলেখ করলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো কল্পনাতেও ভারত হতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা জাতি বা রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেননি। 'মহাজাতি সদনে' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক—এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার উর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে।'

'বাঙালির আশা, কাজ, পণ ও ভাষা সত্য হোক এবং বাঙালির প্রাণ, মন ও ভাইবোনেরা এক হোক'– ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে 'মহাজাতি সদনে' রবীন্দ্রনাথ এই আশা করেন যে, 'বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকেই অকৃতার্থ যেন না করে।'

৬ মে ১৯৩২ সালে তেহরানে তাঁর জন্মদিনের অভিনন্দনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারসিক বন্ধুদের বলেন, 'আমি প্রথমে জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়রা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের। আমি দ্বিজ।' পারস্যে তিনি আরো বলেন, 'যে মানুষ সংকীর্ণভাবে একান্তভাবে স্বাদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ, তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না।'

পথে ও পথের প্রান্তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি যে শতবার একশো হারে বাঙালি নই, আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও, এই কথাটা প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।' কেবল বাঙালি পরিচয় তাঁর জন্য যথার্থ নয় এবং তেমন ইচ্ছা তিনি কোনো দিন প্রকাশ করেননি। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বোধ হয় আমার জীবনের শেষ যুগে সমস্ত পৃথিবীকেই আমার দেশ করে জানতে হবে– ভারতবর্ষের মায়াবন্ধন আমার পক্ষে একেবারে কাটাতে পারলেই ভালো। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, 'সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার দেশ বলে বরণ করে নিয়েছি।' তাঁর বন্ধু এন্ড্রুজকে এক পত্রে তিনি বলেন, 'আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসি, কিন্তু আমার ভারতবর্ষ একটা ভাবাদর্শ। একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি নয়। তাই আমি স্বদেশপ্রেমিক নই, আমি চিরদিন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আমার স্বদেশবাসীদের সন্ধানে থাকবো।'

২৫ এপ্রিল ১৯৩৪ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে য়ুরোপের সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ এক আবেগময় ভাষা প্রকাশ করেন :

'য়ুরোপে মানবমনের সংঘাতে মনের নিগূঢ় শক্তি চরম পূর্ণতায় উদ্বোধিত হয় তাও আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু অনেকখানি বাকি থাকে, সেটা হচ্ছে অন্তরতম সম্বন্ধ, তাকে বিশেষণ করে জানাতে পারিনে। অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ুর সমাবেশে তার বহুধা বেদনা আমার সমস্ত মনকে জড়িয়ে রেখেছে—জন্মপূর্বের

স্মৃতি আছে তার মধ্যে, আমার শ্রুতিতে, আমার চিন্তায়, আমার আকাঙ্ক্ষায় জীবনের বহুতন্ত্রবিশিষ্ট বীণায় সে আপন সুর বেঁধে দিয়েছে। তার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে আমার ভোজে খাদ্য থাকে, এমনকি খাদ্য বেশিও থাকে কিন্তু তার স্বাদ থাকে না। এই কারণে যতবার আমি দেশের বাইরে গেছি এখানকার রূপে রসে ভরা আকাশ আমাকে ডাক দিয়ে পাঠায়। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমস্ত মন দিয়ে আমি ভালোবেসেছি বাঙালির মেয়েকে তার সকরুণ মাধুর্যে আমার মন অভিষিক্ত হয়েছে। যখন দূরে যাই এখানকার শ্যামশ্রীর স্মৃতিপটে তারি ছবিটি ফুটে ওঠে আমার মনে, মেঠো মূলতানের সুরে দূর থেকে বাজতে থাকে তারি কণ্ঠের গান বাংলার ভাষায়—

মনে রইল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায়গো সে
তারে বলি বলি আর বলা হোলো না।

তখন কেবলি মনে পড়তে থাকে তমালতালীবনরাজিনীলা তটভূমি, সমুদ্রের পূর্বপারে। আর মনে পড়ে মেঘচ্ছায়াঘন বর্ষার দিন আর ধারামুখরিত বর্ষার রাত্রি; বুকের মধ্যে বাজতে থাকে, মেঘৈর্মেদুরমম্বরংবনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অন্য কোনো দেশে পাব মাঘের শেষে আমের বোলের গন্ধের সঙ্গে মেশানো ক্লান্ত কোকিলের করুণ ডাক।

তবে এ-ব্যাপারে ওই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ কথা বললেন, 'দেশকে আমি যতই ভালোবাসি না কেন, অনিবার্য কারণে আমার মন তবু আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র।'

সাহিত্যের জন্য যে ছয়জন ব্রিটন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তার মধ্যে এলিয়ট ষষ্ঠ-এই তথ্যটি ১৯৮৪ সালে টিএস এলিয়টের জীবনীকার পিটার অ্যাকরয়েড উলেখ করেন। অন্য পাঁচজন হলেন কিপলিং, ঠাকুর, ইয়েটস, শ' ও গলসওয়ার্দি। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জর্জ বার্নাড শ লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারির তৎকালীন ডিরেক্টর স্যার কেনেথ ক্লার্ককে ন্যাশনাল গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি টাঙাতে বলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কোনোদিন ব্রিটন বা ব্রিটিশ ন্যাশনাল হিসেবে ভাবেননি।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও সমরসঙ্গীতের রচয়িতা যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম উভয়েই ভারতীয় বাঙালি ছিলেন। পরে নজরুলকে যখন নাগরিকত্ব দান করা হয় এবং তাঁকে জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়, তখন তিনি বাকশক্তিরহিত। 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ প্রীত হতেন। তবে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হলে তিনি তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতেন না, যদিও তিনি পূর্ববাংলাকে 'বাংলার বাংলা' বলে অভিহিত করেন। এ দেশের বাংলাদেশ নামকরণের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে প্রতিবাদ করতেন কি না, বলা যায় না। তিনি দলে পড়ে অযথার্থস্থানে দস্তখত দিয়ে পরে অনুশোচনা করেছেন এমন ঘটনা যে ঘটেনি, তা নয়।

১৯৭২ সালে সংবিধান-প্রবর্তনকালে বাংলাদেশের নাগরিক 'বাঙালি' অভিধায় পরিচিত ছিল। পরে রাষ্ট্রজাতির পরিচয়ে সেই পরিচয় 'বাংলাদেশী' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। রাষ্ট্রজাতির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করা।

রবীন্দ্রনাথের জন্য 'ভারতীয় বাঙালি' অভিধাটি তাঁর সঠিক পরিচয়, বিশেষ করে বাঙালি হিসেবে তাঁর আত্মসমালোচনা যখন এমন সময় আমরা আলোচনা করছি যখন বাংলাভাষী হিসেবে বাঙালিদের নাগরিক পরিচয়ে দ্বৈধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় বাঙালি বলার মধ্যে কোনো গূঢ় কারণ নেই। রবিকে আড়াল করার যেকোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রথম আলোর 'দিগদিগন্তর' কলামে 'একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা' ২০০৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগে কিছু সংশোধন-পরিবর্তন করে তারিখ অনুযায়ী নয়, কিছুটা ভাব-পারম্পর্য অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হলো।

প্রথম আলোয় যখন এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় বাঙালি হিসেবে অভিহিত করার জন্য এক প্রতিক্রিয়ায় যে তিনটি চিঠি পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল, সেই চিঠিগুলো পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০০৫

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

সূচিপত্র

বাংলাদেশের কথা ১৫
বঙ্গমাতার স্নেহগ্রাস ও বাঙালি পুরুষ ২২
বাঙালির পরিবারতন্ত্র ২৬
বাঙালির খাওয়া-পরা ৩১
বাঙালির আদবকায়দা ও অবাধ সামাজিকতা ৩৬
বাঙালির বাঁধারীতির বন্ধন ৪৩
বাঙালির দারিদ্র্য ৫৩
বাঙালির দৈন্যদুর্বলতা ৫৮
বাঙালির কাজের ধারা ৬৪
বাঙালির দলাদলি ৭০
বাঙালির ভাবপ্রবণতা ৭৫
বাঙালির ভাবভাষার দৈন্য ৮০
বাঙালির পর্যবেক্ষণশক্তি ও অনুৎসুক্য ৮৬
বাঙালির আত্মাভিমান ও আধ্যাত্মিকার অহঙ্কার ৯২
বাঙালির শিক্ষাদীক্ষা ১০৩
বাঙালির জীবনে পরাধীনতা ১১৯
য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পরশে বাঙালির জাগরণ ১২৪
বাঙালির আত্মসমালোচনা ও ভবিষ্যৎচিন্তা ১২৯
পরিশিষ্ট ১৩৪
নির্ঘণ্ট ১৩৯

বাংলাদেশের কথা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় বাঙালিদের সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করেছেন। ১২৯৮ সালে *স্বদেশ*-এর 'নূতন ও পুরাতন'-এ তিনি বাংলাদেশের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তার দিকে প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া যাক। উক্ত প্রবন্ধে বাংলাদেশের এক দারুণ দৈন্যদশার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি; এত প্রাচীন যে এখানকার ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে; মনুষ্যের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; সেই জন্যে ভ্রম হচ্ছে যেন এ নগর মানব ইতিহাসের অতীত, এ যেন অনাদি প্রকৃতির এক প্রাচীন রাজধানী। মানবপুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে সজ্জিত করেছে। এখানে সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্নরেখা রেখে গিয়েছে এবং সহস্র বৎসরের বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ হরিদবর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত করেছে। এক দিক থেকে একে নগর বলা যেতে পরে, এক দিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এখানে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে। এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গি জটাভারগ্রস্ত শাখাপ্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকাভিত্তির মধ্যে, শতসহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে ভ্রম হয়। এখানকার এই সনাতন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মতো নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে। এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে

তা কর্ম। জগতের মধ্যাহ্ন সূর্যালোক ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কেবল ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়, প্রবল ঝড় শত শত সংকীর্ণ শাখাসংকটের মধ্যে প্রতিহত হয়ে মৃদু মর্মরের মতো মিলিয়ে আসে। এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেছে; অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা একসঙ্গেই ধাবিত হয়েছে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্‌ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে আছে সেইখানে পড়েই আছে, এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেউ অলস ভক্তিভরে, হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই-ই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থবিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করছে।'

রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অবতরণিকা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে, প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

'তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোনো সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়, বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে, কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে মরুবালুতলে ভূমির মতো।

'এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান্ প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্বজনসমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।'

১৩৪৩ সালে রবীন্দ্রনাথ 'জলোৎসর্গ'-এ সুজলা সুফলা বাংলাদেশের ভগ্নদশার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেন : 'আমাদের মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা বলে স্তব করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই, যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র পঙ্কবিলীন—যে করে আরোগ্যবিধান সেই আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্যক্ষেত্রে। সমস্ত দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত, মলিন, রুগ্ন, উপবাসী।

'মাতৃভূমির মাতৃত্ব প্রধানত আছে তার জলে তাই মন্ত্রে আছে অপো অস্মান মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু। জল মায়ের মতো আমাদের পবিত্র করুক।...অথচ বারে বারে

বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই। হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই যে, পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে যথোচিত আধার-অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অযাচিত দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে মারে।'

১৩৪৭ সালে 'সাহিত্য বিচার'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশে আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদীবংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয় নি। এরা অল্প কালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে, তার পরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন করা বিড়ম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশের অভিজাতবংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। এ কথা সত্য, এই স্বল্পকালীন ধনসম্পদের আত্মসচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহংকারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক রাখবার আড়ম্বর করে।'

২৩ জুন ১৮৯১ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সৌন্দর্যের এক বিশিষ্টতার উল্লেখ করেন, 'আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সবচেয়ে চোখে পড়ে—আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এরমধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়—মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে তাদের অল্প অল্প কলবর শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়—কিন্তু এই অনন্ত প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যেপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়।'

বাংলাদেশের সৌন্দর্য বর্ণনায় ২ ডিসেম্বর ১৮৯২ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার

প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে—কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা—আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি [স্নেহভারবিনত] মৌন ম্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যাবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটি [উদাস] আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়—সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা—অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে [দেখতে] মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [তা হলে] কী-একটা গভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত [সম্মি] লিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎবাসী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম। [কম্পন] ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন [করে] অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!'

২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রতি তাঁর টান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই জন্যেই বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর নেই।'

আলোচনায় 'স্বদেশ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য বোধ হয়। বাঙ্গালা

দেশ দেখিতে ভাল নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোল-ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমলহৃদয়া, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইহার কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইহার সৌন্দর্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাংলাদেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাংলাদেশ সে দেখেই নি—বাংলাদেশে সে কখনো যায়নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি, এত নদী দেখিয়াছি, কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তার তরঙ্গ বেশি। ইত্যাদি।'

ওই গ্রন্থের 'কেন'-তে তিনি আরো বললেন, "এই কেন লইয়াই ত যত মারামারি। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাংলার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাংলাই ভাল দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবধি বাংলা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুন ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে। তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে, বাংলা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভালবাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ, সকলেরই প্রাণ আছে। ভালবাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বাধাবিপত্তিময়—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকে না, চোখে কিছু পড়ে না, শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর 'কেন' ঘেঁষিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতখানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য ভূগোলবিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দূরদূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

চিঠিপত্র-এ শ্রীনবীন কিশোর শর্মণঃ বলছেন, 'স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভালো না বাসিলে যেমন স্বদেশের কাজ করা যায় না, তেমনি স্বকালকেও ভালো না বাসিলে স্বকালের কাজও করা যায় না। যদি ক্রমাগতই স্বদেশের নিন্দা করিতে থাক, স্বদেশের কোনো গুণই দেখিতে না পাও, তবে স্বদেশের উপযোগী কাজ তোমার দ্বারা ভালোরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কেবলমাত্র কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তুমি স্বদেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতে পারো, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। তোমার হৃদয়হীন কাজগুলো বিদেশী বীজের মতো স্বদেশের জমিতে ভালো করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তেমনি স্বকালের যে কেবল দোষই দেখে, কোনো গুণ দেখিতে পায় না, সে চেষ্টা করিলেও স্বকালের কাজ ভালো করিয়া করিতে পারে না। এক হিসাবে সে নাই বলিলেও হয়: সে জন্মায় নাই, সে অতীতকালে জন্মিয়াছে, সে অতীতকালে বাস করিতেছে; এ কালের জনসংখ্যার মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না।'

১৩১৩ সালে 'সাহিত্য পরিষৎ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'কেবল সংকল্পের তালিকা বাড়াইয়া চলিলে কোনো লাভ নাই; কিন্তু যেমন করিয়া হউক, দেশের যথার্থ স্বকীয় একটি-একটি কাজকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে।...

'দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য যেখানেই আমাদের সকলের চেষ্টা মিলিত হইতে থাকিবে সেখানেই আমাদের স্বদেশ সত্য হইয়া উঠিবে। দেশ জিনিসটা তো কাহাকেও নিজের শক্তিতে উপার্জন করিয়া আনিতে হয় নাই। আমরা যে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতে এই বাংলাদেশেই জন্মিতেছি ও মরিতেছি সে তো আমাদের নিজগুণে নহে এবং বাংলাদেশেরও বিশেষ পুণ্যপ্রভাবে এমনও বলিতে পারি না। দেশ পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গেরও আছে। কিন্তু স্বদেশকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয়। সেইজন্যেই স্বদেশে কেহ হাত দিতে আসিলে স্বদেশীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে; কেননা, সেটা যে বহুকাল হইতে তাহাদের নিজের গড়া সেখানে যে তাহাদের বহুযুগের আহরিত মধু সমস্ত সঞ্চিত হইয়া আছে। যেসকল দেশের লোক তাহাদের নিজের শরীর-মন বাক্যের সমস্ত চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে স্বদেশকে আপনি গড়িয়া তুলিতেছে, দেশের অন্নবস্ত্রস্বাস্থ্যজ্ঞানের সমস্ত অভাব আপনি পূরণ করিয়া তুলিতেছে, দেশকে তাহারাই স্বদেশ বলিতে পারে এবং স্বদেশ জিনিসটা যে কী তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতেও হয় না; মৌমাছিকে আপন চাকের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য বড়ো বড়ো পুঁথির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমরা দেশের কোনো সত্যকর্মে নিজেরা হাত না লাগাইয়াও আজ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ইংরেজি ও বাংলায়, গদ্যে ও পদ্যে, স্বদেশের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই স্বদেশের স্ব'টা যে কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গোলড্‌স্টুকর ম্যাক্সমূলর মুয়রের প্রত্নতত্ত্ব

খুঁজিয়া হয়রান হইতে হইয়াছে। শাণ্ডিল্যমুনির আশ্রমের জায়গাটার যদি আজ হঠাৎ আবিষ্কার হয় তবে আমি শাণ্ডিল্যগোত্রের দোহাই দিয়া সেটা দখল করিতে গেলে আইনের পেয়াদা তো মানিবে না। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্বের উপর স্বদেশের স্বকীয়ত্বের বরাত দিয়া গৌরব করিতে বসিলে কেবল গলা ভাঙাই সার হয়। স্বকীয়ত্বকে অবিচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আজ আমাদের পক্ষে স্বদেশ কোথায়? সমস্ত দেশের মধ্যে যেখানেই আমরা নিজের শক্তিতে দেশবাসীদের জন্য কিছু একটা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের স্বদেশ। এমনি করিয়া যাহা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহাতেই আমাদের স্বদেশের বিস্তার ঘটিতে থাকিবে, সেই স্বদেশের উপর আমাদের সমস্ত প্রাণের দাবি জন্মিতে থাকিবে; অন্যে যাহা দয়া করিয়া দিবে তাহাতেও নহে এবং বহু হাজার বৎসর পূর্বে যে দলিল পাকা হইয়াছিল তাহাতেও না।'

১৮ এপ্রিল ২০০৩

বঙ্গমাতার স্নেহগ্রাস ও বাঙালি পুরুষ

বাঙালির জীবনে জননীর প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ 'স্নেহগ্রাস' বলে চিহ্নিত করে ২৫ চৈত্র ১৩০২ ওই নামে নিম্নলিখিত চতুর্দশপদী কবিতাটি রচনা করেন :

'অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী,
হে জননী, আপনার স্নেহকারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহপরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার ॥'

পরের দিন একই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গমাতা' নামে আর একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। শেষ দুটি চরণে লক্ষণীয় আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের :

'পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে

হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ কর নি ॥'

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি-তে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মাতৃস্নেহ সম্পর্কে বলেছেন : '...প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। এক পারে চোরাবালি, আর এক পারে ফসলের খেত। এক পারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্য পারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ। মাতৃস্নেহের মধ্যেও এই দুই জাতের প্রেম। একটাতে প্রধানত আসক্তি নিজের পরিতৃপ্তি খোঁজে, সেই অন্ধ মাতৃস্নেহ আমাদের দেশে বিস্তর দেখতে পাই। তাতে সন্তানকে বড়ো করে না তুলে তাকে অভিভূত করে। তাতে কোন পক্ষেরই কল্যাণ নেই। যে প্রেম ত্যাগের দ্বারা মানুষকে মুক্তি দিতে জানে না পরন্ত ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে আত্মসাৎ করতে চায় সে প্রেম তো রিপু। এক পক্ষকে ক্ষুধার দাহে সে দগ্ধ করে, অন্য পক্ষকে লালায়িত আসক্তি দ্বারা লেহন করে জীর্ণ করে দেয়। এই মাতৃ লালনপাশের পরিবেষ্টনের মধ্যে যারা চির অবরুদ্ধ আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা বিস্তর; তাদের শৈশব আর ছাড়তে চায় না। আসক্তিপরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশ পালনের অনর্থ বহন করে অপমানের মধ্যে অভাবের মধ্যে চিরজীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে, এমন সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়রাজত্ববিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশী শাসনের হাতকড়ির নির্মমতার দ্বারাও হয়নি।'

১৩০৪ সালে *পঞ্চভূত*-এর 'নরনারী'তে বাঙালি পুরুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন : 'বঙ্গদেশে পুরুষের কোন কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছুই নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালোমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে ষ্টীমবোট যেমন বৃহৎ বোঝাইভরা গাধা বোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে,

তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী লোকলৌকিকতা আত্মীয় কুটুম্বিতা পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামীনামক একটি চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অন্য দেশে পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোন কর্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে।'

তিন সঙ্গীর 'ল্যাবরেটরি'তে অধ্যাপক চৌধুরী সোহিনীকে বলছেন : 'মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষ মহলে শুনেছ কি।'

বহু মাতৃকাদেবীর দেশ বাংলাদেশের বন্দনায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও মা মা ধ্বনি বারবার শোনা যায়। আমার সোনার বাংলা-র মা ছাড়াও আরো অনেক গানে 'সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'-র গুণার্চনা করা হয়েছে।

চিঠিপত্র-এ শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ দাদা মহাশয়কে লিখছেন : 'বঙ্গদেশ এখান হইতে কত শত ক্রোশ দূরে! কিন্তু এখান হইতে বঙ্গভূমির এক নূতন মূর্তি দেখিতে পাইতেছি। যখন বঙ্গদেশের ভিতর বাস করিতাম, তখন বঙ্গদেশের জন্য বড়ো আশা হইত না। তখন মনে হইত বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল-গাছে-কাঁঠালের দেশ। যতবড়ো-না-মুখ-ততবড়ো-কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শামলার দেশ। মনে হইত এখানে বিচিগুলাই দেখিতে দেখিতে তেরো হাত হইয়া কাঁকুড়কে অতিক্রম করিয়া উঠে। এখানে পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা হাত-পা নাড়িয়া কেবল একটা প্রহসন অভিনয় করিতেছে, এবং মনে করিতেছে দর্শকেরা শুদ্ধ কেবল আড়ি করিয়া হাসিতেছে, হাসির কোনো যুক্তিসংগত কারণ নাই। কিন্তু আজি এই সহস্র ক্রোশ ব্যবধান হইতে বঙ্গভূমির মুখের চতুর্দিকে এক অপূর্ব জ্যোতির্মণ্ডল দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশ আজ মা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার কোলে বঙ্গবাসী নামে এক সুন্দর শিশু—তিনি হিমালয়ের পদপ্রান্তে সাগরের উপকূলে, তাঁহার শ্যামল কানন তাঁহার পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে, তাঁহার গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের তীরে, এই শিশুটি কোলে করিয়া লালন করিতেছেন। এই সন্তানের মুখের দিকে মাতা অবনত হইয়া চাহিয়া আছেন, ইহাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে আশা ও আনন্দের আভা দীপ্তি পাইয়া উঠিয়াছে। সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিয়া আমি মায়ের মুখের সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি। আমি আশ্বাস পাইতেছি এ সন্তান মরিবে না। বঙ্গভূমি এই সন্তানটিকে মানুষ করিয়া ইহাকে

একদিন পৃথিবীর কাজে উৎসর্গ করিতে পারিবেন। বঙ্গভূমির কোল হইতে আজ মাঝে মাঝে শিশুর হাসি, শিশুর ক্রন্দন শুনিতেছি—বঙ্গভূমির সহস্র নিকুঞ্জ এতদিন নিস্তব্ধ ছিল, বঙ্গভবনে শিশুর কণ্ঠধ্বনি এতদিন শুনা যায় নাই, এতদিন এই ভাগীরথীর উভয় তীর কেবল শ্মশান বলিয়া মনে হইত। আজ বঙ্গভূমির আনন্দ উৎসব ভারতবর্ষে চারি দিক হইতে শুনা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে নব জাতির জন্ম-সংগীত গান হইতেছে, ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পশ্চিমঘাটগিরি সীমান্তদেশে বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে থাকিয়া যাহা কেবলমাত্র অর্থহীন কোলাহল মনে হইত এখানে তাহার এক বৃহৎ অর্থ দেখিতে পাইতেছি। এই দূর হইতে বঙ্গদেশের কেবল বর্তমান নহে, ভবিষ্যৎ—প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিমাত্র নহে, সুদূর সম্ভাবনাগুলি পর্যন্ত—দেখিতে পাইতেছি। তাই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইতেছে।'

মাতৃভূমির বন্দনায় এবং দেশমাতৃকাকে বারংবার মা মা আহ্বানের কারণে রাজনীতিকদের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা রাজনৈতিক দশা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে *রাশিয়ার চিঠি*তে রবীন্দ্রনাথ বেশ একটি টিপ্পনি কেটেছেন : 'যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটি কয়েক আদুরে ছেলের মা।'

বাঙালি মাতার যে স্নেহগ্রাসের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ইংরেজিতে তাকে বোধ হয় 'মমিজম' বলে। সাধারণভাবে জন্মলগ্ন থেকে মায়ের কাছে সন্তান দুর্বল ও অসহায় বলে বিবেচিত। তাকে রক্ষা করার জন্য জৈব দায়িত্ব পালন করে মা সন্তানের ওপর খবরদারি করার এক অধিকার অর্জন করে এবং সন্তানের কাছে পরম আনুগত্য প্রত্যাশা করে। মানব সংসারে মা-অন্ত-প্রাণ সন্তানদের বাঙালি সমাজের বাইরেও যে দেখা যায় না তা নয়। এ প্রসঙ্গে জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ যেসব উক্তি বা মন্তব্য করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, অকৃষি পেশার প্রসার এবং সমাজে চলমানতা বৃদ্ধির ফলে পৈতৃক ভিটার প্রতি মানুষের টান যেমন কমেছে তেমনি সন্তানদের মনের ওপর মায়ের অঞ্চল-প্রভাবও হ্রাস পেয়েছে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মাতৃদুগ্ধে লালিত পালিত হওয়া তার জন্য যেমন স্বাস্থ্যকর, মাতৃস্তন্য ত্যাগ করার পরও মায়ের স্নেহপুটে আশ্রয় নেওয়া তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গড়নের জন্য তেমনই অন্তরায়।

২০ জুন ২০০৩

বাঙালির পরিবারতন্ত্র

বাঙালির পরিবারতন্ত্রের ফলে কীরকম বিধিনিষেধের প্রাচীর উঠেছে, স্বভাবের ভীরুতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে সে-সম্পর্কে ১৩২২ সালে 'কৃপণতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশের ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের ধাক্কাতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকব্জা তো একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

'মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তি ভাগ আছে।...

'কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সেখানে মানুষ আপন বাড়তি অংশ দিয়া কী সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য আপন বসতির জন্য কোন্ ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে?

'ইংলন্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

'আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালি পড়িল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া

গেল, কিসের জন্য? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্য তো নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইকটিকে পড়াইতে হইবে, দুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।...

'রেলে ইস্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

'বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি...

'বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম।...

'এদিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিস। লোকহিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী-দেশবোধ বলিয়া একটা বড়ো রকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালিহাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড়ো দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভরতি করিতে পারে না;—বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

'পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে।...

'আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এই জন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবারবৃদ্ধিকে লোকবলবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতরো বৃহৎ পরিবারকে একত্র রাখিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্তাকে নির্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়।...

'প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষ্যে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয়

সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারিদিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুটপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব হয় ইহারা কেবলই তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইহাদের সাধনা, ধন আছে কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্যায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

'এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই।...

'পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সংকীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপ-দাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

'যাই হোক, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন-দেবতাদের পূজা যথাসর্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলই নরবলি দিয়া আসিতেছি।

'পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছি জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।...

'ঐশ্বর্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলই ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে,-সেখানে তাদের ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা।

তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেননা চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

'এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড়ো রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

'নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

'সকলের চেয়ে সর্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চলো।'

১৩২২ সালে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'-এ পরিবারবন্ধন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমাদের পরিবারবন্ধন সকলের চেয়ে সাংঘাতিক বন্ধন হয়ে উঠেছে। তার বহু বিচিত্র জটিল জালে মানুষকে বিশ্বক্ষেত্র থেকে সে নিরস্ত করে জড়িয়ে রেখেছে। আমরা যতই বেশি পারিবারিক হয়ে উঠছি ততই বিশ্বব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছি। কেননা, আজকালকার দিনে যারা নিছক ঘরের ছেলে, তারা কেবলি হটে যাবে। আমরা একদিন ঘর ছাড়ব বলেই ঘর ফেঁদেছিলুম। আজ আমরা আর সমস্তই ছেড়েছি কেবল ঘরখানাই আছে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যারা, তারা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করে, অবশেষে তাদের শক্তিই তাদের স্বাতন্ত্র্যের ঘাড়ে চেপে বসে। আমাদের দেশে তাই ঘটেছে, আমরা মুক্তির প্রেমে বন্ধনকে মেনেছিলুম, আজ বন্ধনের প্রেমে মুক্তিকে খুইয়ে বসেছি।'

অবিভক্ত হিন্দু পরিবার হিন্দু পরিবারতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একান্নবর্তী পরিবারের দাপট মুসলমান সমাজে তেমন নেই। এজমালি ও স্বোপার্জিত সম্পত্তি সম্পর্কে উভয় সমাজের ধারণায় যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে। হিন্দু সমাজে একান্নবর্তী পরিবার হতে পৃথক হওয়া কঠিন ছিল। মুসলমান সমাজে ফারাজ কষে বাঁটোয়ারার বিধান মসজিদের মৌলভি সাহেবও দিতে পারেন। যৌথ পরিবার থেকে আলাদা হওয়া মুসলমানদের পক্ষে সহজ। হিন্দু আইনের যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। বিদ্যা দ্বারা

অর্জিত সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হয়। বর্তমানে হিন্দু সমাজে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সমাজে চলমানতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন পেশার তাগিদে এমনটি ঘটছে। ভারতে হিন্দু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকারের আইনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। হিন্দু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ও উত্তরাধিকারের অধিকার আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে। হিন্দু পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থপরতায় চিরাচরিত পারিবারিক আনুগত্যে বেশ কিছু চিড় দেখা যাচ্ছে।

যেখানে পারিবারিক আদর্শ দুটি সন্তানই যথেষ্ট, সেখানে বৃহৎ পরিবার অর্থনৈতিক কারণে ছোট হয়ে যাচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদরা অবশ্য বলছেন সকলের স্বাভাবিক ঋদ্ধিবৃদ্ধির জন্য তিন প্রজন্মের সংসার নাকি সবচেয়ে ভালো।

১৮ জুলাই ২০০৩

বাঙালির খাওয়া-পরা

বাঙালির খাওয়া-পরা নিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানা কথা বলেছেন। ১০ নভেম্বর ১৮৯৪ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'দুপুরবেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক জিনিস আর কিছু নেই, ওতে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং উচ্চ অঙ্গের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি একেবারে অভিভূত করে ফেলে। বাঙালিরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করে বলেই মধ্যাহ্নের একটি নিবিড় ভাব-সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না—দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকে। তাতে করেই দিব্যি চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। আমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে।'

১৯৩০ সালে *রাশিয়ার চিঠি*তে তিনি বলছেন, 'আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে বাংলাদেশে যেমন কদাচার এমন আর কোথাও নেই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি। এ সম্বন্ধে সংস্কার করা বড়ো কঠিন। স্বজাতির চিরন্তন হিতের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের ছাত্ররা ও শিক্ষকেরা পথ্য সম্বন্ধে নিজের রুচিকে যথোচিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার পণ গ্রহণ করতে যদি পারত তা হলে আমি যাকে শিক্ষা বলি সেই শিক্ষা সার্থক হত। তিন নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্থ করাকে আমরা শিক্ষা বলে গণ্য করে থাকি, সে সম্বন্ধে ছেলেরা কোনোমতেই ভুল না করে তার প্রতি লক্ষ্য না করাকে গুরুতর অপরাধ বলে জানি, কিন্তু যে জিনিসটাকে উদরস্থ করি সে সম্বন্ধে শিক্ষাকে তারচেয়ে কম দাম দেওয়াই মূর্খতা। আমাদের প্রতি দিনের খাওয়া সম্বন্ধে

আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাসের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।'

১৯২৩ সালে *জাপান-যাত্রীতে* তিনি লিখছেন : 'একটি সাধারণ মেয়েকে খাবার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি—পাত্র হাতে তুলে ধরা, গ্রাস মুখে তুলে নেওয়া, সমস্তই সুবিহিত যত্নে ও সংযতভাবে করে—আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে আহার ব্যাপারে যে অসংযম ও অশোভনতা আছে এ তার একেবারেই বিপরীত।'

১৯৩৬ সালে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখরোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন-কি বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আঁকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না; মনে করি পালটা ছেঁড়া বলেই পারঘাটে পৌঁছানো হচ্ছে না।"

১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮ কলকাতায় এক খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আহার্যের অপূর্ণতাবশত দীর্ঘকাল হতে আমাদের প্রাণসম্বলের ক্ষয় হয়েছে এবং নিরন্তর হতে চলেছে সে-কথা এতদিন ভুলেছিলাম, কিন্তু আর ভুললে চলবে না। যে-সকল জাতি প্রবল শক্তিমান তাদের সঙ্গে সকল বিষয়েই আমাদের প্রতিযোগিতার সময় এসেছে। জীবিকার ক্ষেত্রে আমরা ছোটো বড়ো সকল দিক থেকে হটে যাচ্ছি। বাইরের সুযোগ সম্বন্ধে বিঘ্নকে দোষ দিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু সেই বিঘ্নের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লড়াই করতে যে পারি নে তার গোড়াকার কারণ আমাদের অপথ্যসংকুল খাদ্য যেটুকু শক্তির যোগান দেয় সে কেবল মানবজগতের বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেপথ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকবার মতো, সভ্যতার দুরূহ পথযাত্রায় শক্তি দেবার মতো নয়। তাই দুর্গমের অধ্যবসায়ে কেবলি আমাদের ক্লান্তি আসে, আমরা হার মানি। বুদ্ধির মূলধন আমাদের যথেষ্ট নেই সে কথা সত্য নয় কিন্তু সেই বুদ্ধিকে অক্লান্ত চেষ্টায় ষোলো আনা খাটাতে যে উদ্যমের প্রয়োজন তাকে রক্ষা করতে পারা *পুরুষানুক্রমে যথোচিত খাদ্য সেবন।*'

তিনি আরো বলেন, 'অতএব যে সকল কর্তব্যকে আমরা ন্যাশনাল আখ্যা দিয়ে গৌরব ক'রে থাকি ভোজ্যের উৎকর্ষ সাধন তার মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে। তাই যখন ভারতীয় সকল জাতির খাদ্য বিশ্লেষণ-তালিকায় দেখা যায় বাঙালির খাদ্য পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় সকলের নিচের কোঠায় তখন সে জন্যে লজ্জিত না হয়ে থাকতে পারি নে। বাঙালি জাতিকে কোনো বিদেশী যদি নির্বোধ ব'লে নিন্দা করত তবে সেই অভিযোগ কখনো আমরা ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার করতে

পারতুম না। কিন্তু যে আহারের প্রথা জীবনীশক্তির অনুকূল নয়, যা সমস্ত জাতিকে অক্ষমতার পথে ক্ষয়ের পথে শনৈঃ শনৈঃ নিয়ে চলেছে জেনেশুনেও সেই আত্মঘাতী অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে না পারার মতো মূঢ়তা কি কম ভর্ৎসনার যোগ্য।

'জেনে শুনে নয়ত কী। আজ বাংলাদেশে কে না জানে যে চোখ-ভোলানো সাদা রঙের মোহে আমরা যে কলের চালের ভাত খেয়ে থাকি তার পরিত্যক্ত অংশই খাদ্য হিসাবে মূল্যবান। চালের সেই ছাল বিদেশে রপ্তানি হয়। আহার্য সম্বন্ধে যাদের বুদ্ধি সজাগ এবং নির্বাচনশক্তি সতর্ক তারা আমাদের ভোজ্যের সেই অনাদৃত আবর্জনাকেই সমাদরে গ্রহণ করে। আজ কে না জানে ভাতের ফেনের সঙ্গে বাঙালির প্রাণশক্তির ধারা প্রতিদিন গড়িয়ে চলে যাচ্ছে রান্নাঘরের নর্দমায়। কিন্তু স্বজাতির আয়ুক্ষয় নিবারণ লক্ষ্য করে নিজেদের অভ্যাসের সঙ্গে রুচির সঙ্গে লড়াই করতে যারা না পারে তারা নিজের বিদেশী শত্রুভাগ্য নিয়ে বিলাপ পরিতাপ করতে যেন লজ্জাবোধ করে।'

১৩১৯ সালে 'বোম্বাই শহর' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে, কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে মেরজাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা-দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।'

১৯৩২ সালে *পারস্যে*-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কালো কালো আঙরাখায় মেয়েদের সর্বাঙ্গ ঢাকা, মুখেরও অনেকখানি, কিন্তু বুরখা নয়। সাধারণত পুরুষদের কাপড় য়ুরোপীয়, ক্বচিৎ দেখা গেল পাগড়ি ও লম্বা কাপড়। বর্তমান রাজার আদেশে দেশের পুরুষেরা যে টুপি পরেছে তার নাম পহ্লবী টুপি। সেটা কপালের সামনে কানা-তোলা ক্যাপ।

'আমাদের গান্ধিটুপি যেমন শ্রীহীন ভারতের-প্রথা-বিরুদ্ধ ও বিদেশী-ঘেঁষা এও সেইরকম। কর্মিষ্ঠতার যুগে সাজের বাহুল্য স্বভাবতই খসে পড়ে। তা ছাড়া একেলে বেশ শ্রেণীনির্বিশেষে বড়ো ছোটো সকলেরই সুলভ ও উপযোগী হবার

দিকে ঝোঁকে। য়ুরোপে একদা দেশে দেশে, এমন-কি এক দেশেই, বেশের বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল। অথচ সমস্ত য়ুরোপ আজ এক পোশাক পরেছে, তার কারণ সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়ে বয়েছে একই হাওয়া। সময় অল্প, কাজের তাড়া বেশি, তার উপর সামাজিক শ্রেণীভেদ হালকা হয়ে এসেছে। আজ য়ুরোপের বেশ শুধু যে শক্ত মানুষের, তৎপর মানুষের তা নয়, এ বেশ সাধারণ মানুষের—যারা সবাই একই বড়ো রাস্তায় চলে। আজ পারস্য তুরস্ক ইজিপ্ট এবং আরবের যে অংশ জেগেছে সবাই এই সর্বজনীন উর্দি গ্রহণ করেছে, নইলে বুঝি মনের বদল সহজ হয় না। জাপানেও তাই। আমাদেরও ধুতি পরা ঢিলে মন বদল করতে হলে হয়তো বা পোশাক বদলানো দরকার। আমরা বহুকাল ছিলুম বাবু, হঠাৎ হয়েছি খণ্ড-ত-ওয়ালা শ্রীযুৎ, অথচ বাবুর দোদুল্যমান বেশই কি চিরকাল থাকবে। ওটাতে যে বসনবাহুল্য আছে সেটা যাই-যাই করছে, হাঁটু পর্যন্ত ছাঁটা পায়জামা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। যুগের হুকুম শুধু মনে নয়, গায়ে এসেও লাগল। মেয়েদের বেশে পরিবর্তনের ধাক্কা এমন করে লাগে নি—কেননা মেয়েরা অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু, পুরুষরা বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের।'

আবহমান বাঙালির খাদ্যতালিকায় ওগরা ভাত, কলাপাতা, গাওয়া ঘি, দই, ময়না মাছ ও নালিতা শাকের উল্লেখ রয়েছে। উচ্ছের কচি, পটোলের বিচি, ছাগলের ছা, মাছের মা, খলসে মাছের ঝোল, ইলিশ মাছের ঝোল, ইচা মাছের সঙ্গে কদু যে বাঙালের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ইত্যাদি বচনের কথা আমাদের মৌখিক সংস্কৃতিতে বারবার উল্লেখ দেখা যায়।

বর্তমানে গ্রামে ও শহরে দরিদ্র স্বল্পবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কাঠ, খড়, পাতা, পাটখড়ির পরিবর্তে গ্যাস, বিদ্যুৎ জ্বালানির ব্যবহার শহরে বেড়েছে। সরষের তেলের পরিবর্তে সয়াবিন ছাড়া বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ তেলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিত্তবানদের প্রাতঃরাশে খইমুড়ির পরিবর্তে রুটি, মাখন, ফ্লেকস, ডিম ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে। আমাদের সমাজে এখন নানান ধরনের নতুন সবজি চালু হয়েছে। আলুর চল পর্তুগিজরা শুরু করেছিল। এখন মাশরুম, ব্রোকোলি, স্কোয়াশ, জুকিনি ইত্যাদি নতুন সবজি বড় শহরে দেখা যাচ্ছে। তেলাপিয়া, কার্প, গ্লাসকার্প, থাইল্যান্ডের মাগুর মাছ আমাদের আমিষের নতুন উৎস। ভূমণ্ডলায়নের যুগে সারা পৃথিবীর খাবার রাজধানী ও অন্যান্য মহানগরের হোটেলে-রেস্তোরাঁয় পরিবেশিত হচ্ছে। আগের চেয়ে আমরা ক্যালোরি-পুষ্টি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন। যেখানে সেখানে আমরা এখন পানি খাই না।

আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে নতুন নতুন স্টাইল বা ফ্যাশন দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের এখন নতুন নতুন নানান পোশাক এবং শাড়ির নানান বাহার ও নানান

নাম। এখন কাঁচুলির চেয়ে ব্রার চল বেশি। মিনি স্কার্ট দেখা না গেলেও মাঝারি ও হাউস কোটের চল হয়েছে। সমুদ্রসৈকতে বিকিনি পরিহিতা বাঙালি ললনাকে দেখা না গেলেও উজ্জ্বল নানান রঙের সুইমিং স্যুট কালেভদ্রে দেখা যায়। কার্পাস, শন, পাট, রেশম ও পশমের পরিবর্তে নানা রাসায়নিক তন্তুর ব্যবহার দেখা যায়।

রাজনীতিঘেঁষা পোশাকের মধ্যে গান্ধিটুপি, জিন্নাহ ক্যাপ, জহর কোট, মুজিব কোটের প্রচলন এখন কমে যাচ্ছে। ফিদেল কাস্ত্রো ও চৈনিক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকেও এখন ইউরোপীয় বিজনেস স্যুট পরতে দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই ঢিলেঢালা কাপড় পরতে ভালোবাসতেন। আঁটোসাঁটা কাপড়ে তিনি স্বস্তি পেতেন না। লেখাপড়ার জন্য ঢিলেঢালা পোশাক নিঃসন্দেহে আরামদায়ক। যেখানে দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়, কাজকর্মে হাত লাগাতে হয়, সেখানে আঁটো কাপড়ের কিছু সুবিধা রয়েছে। শাড়ি অনেক সময় কামিজ-দোপাট্টার কাছে হেরে যাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে প্যান্ট-শার্টের চল আগের চেয়ে বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে বাঙালির খাওয়া-পরায় বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন বিশেষ করে বিত্তবানদের মধ্যে সীমিত, দরিদ্রজনের মধ্যে তেমন পরিবর্তন আসেনি। অবশ্য আজকাল খালি গায়ে থাকা বা খালি পায়ে চলা প্রায় উঠেই গেছে।

১৫ আগস্ট ২০০৩

বাঙালির আদবকায়দা ও অবাধ সামাজিকতা

১৩৩৮ সালে 'নামের পদবী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশে সামাজিক ব্যবহারে পরস্পরের সম্মানের তারতম্য জাতের সঙ্গে বাঁধা ছিল। দেখা-সাক্ষাৎ হলে জাতের খবরটা আগে না জানতে পারলে অভিবাদন-অভ্যর্থনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকত। পাকা পরিচয় পেলে তবে একপক্ষ পায়ের ধুলো দেবে, আর এক পক্ষ নেবে, আর বাকি যারা তারা পরস্পরকে নমস্কার করবে কিম্বা কিছুই করবে না এই ছিল বিধান। সামাজিক ব্যবহারের বাইরে লৌকিক ব্যবহারে যে-একটা সাধারণ শিষ্টতার নিয়ম প্রায় সকল দেশেই আছে—আমাদের দেশে অনতিকাল পূর্বেও তা ছিল না। যেখানে স্বার্থের গরজ ছিল এমন কোনো কোনো স্থলে এ নিয়ে মুশকিল ঘটত। উচ্চপদস্থ বা ধনশালী লোকের কাছে উমেদারী করবার বেলা নতিস্বীকার করে তুষ্ট করা প্রার্থীর পক্ষে অত্যাবশ্যক কিন্তু জাতে বাঁধা রীতি ছাড়া আর কোনো রীতি না থাকাতে কিছুদিন পূর্বে এই রকম সংকটের স্থলে সম্মানের একটা কৃপণ প্রথা দায়ে পড়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সে হচ্ছে ডান হাতে মুঠো বেঁধে দ্রুতবেগে নিজের নাসাগ্র আঘাত করা, সেটা দেখতে হোত নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার মতো। এই রকম সংশয়কুণ্ঠিত অনিচ্ছুক অশোভন বিনয়াচার এখন আর দেখতে পাইনে।

'তার প্রধান কারণ, বাঙালি সমাজে পূর্বকালের গ্রাম্যতা এখন নেই বললেই হয়, জাতের গণ্ডি পেরিয়ে লোকব্যবহারে পরস্পরের প্রতি একটা সাধারণ শিষ্টতার দাবি স্বীকার করবার দিন এসেছে। তা ছাড়া কাউকে বিশেষ সম্মান দেবার বেলায় আজ আমরা বিশেষ করে মানুষের জাত খুঁজিনে। মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধের বেলায় কোনো কোনো পরিবারে আজো কৌলিন্যের আদর থাকতে পারে—কিন্তু বৈঠক-মজলিসে সভা-সমিতিতে ইস্কুলে-কলেজে আপিসে-আদালতে তার কোনো চিহ্ন নেই; সে সব জায়গায় ব্রাহ্মণের চেয়ে কুলীনের চেয়ে অনেক বড়ো মনে সর্বদাই

অন্য জাতের লোক পেয়ে থাকে। অতএব আজকের দিনে জনসমাজে কার কোন আসন সেটা জাতের দ্বারা ঘের দিয়ে সুরক্ষিত নেই, ভোজের স্থানেও পঙ্‌ক্তি বিভাগের দাগটা কোথাও বা লুপ্ত, কোথাও বা অত্যন্ত ফিকে। মানুষের পরিচয়ে জাত-পরিচয়ের দামে এক সময়ে যত বড়ো ছিল এখন তা প্রায় নেই বলা যেতে পারে।'

১৩২৩ সালে জাপান যাওয়ার পথে স্টিমারে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা : 'এদের মধ্যে সংসারটাকে মানে কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাতরক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এইজন্যে আদবকায়দা মুসলমানের। আদবকায়দা হচ্ছে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে; কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই। এইজন্যে সম্পর্কবিচার ও জাতিবিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম-ভারত মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেছে। কেননা, প্রণাম-নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্বে আমরা অস্বীকার করে চলেছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েছি নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্ছি; ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেইজন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না। বাঙালি ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ; সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বললেই হয়—অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যে রকম, অর্থাৎ দিগবসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসি প্রভৃতি কোনো একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি; নইলে আমরা থই পাই নে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা নয় অত্যন্ত দূরত্ব, এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে সেটা আজও আমাদের ভালো করে আয়ত্ত হয়নি। এমন কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যেসব মানুষকে হৃদয় দিতে পারি নে তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে, গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ বলেই এই সাধারণ আদবকায়দাকে আমাদের কৃত্রিম বলে ঠেকে। বস্তুত, ঘরের মানুষকে আত্মীয় বলে এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের বলে এবং তারও বাইরের মানুষকে

মানবসমাজের বলে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন এবং আদবকায়দার বন্ধন এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।'

১৩১৯ সালে 'সমাজভেদ'-এ তিনি বলেন, 'পরিবার এবং পল্লীমণ্ডলীর সীমায় আসিয়া আমাদের সমাজ থামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরস্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলো বাঁধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কৃত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

'কিন্তু যে সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নহে এবং সে সমাজ আত্মীয় সমাজ। সুতরাং আমাদের আদবকায়দাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে তামাক খাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাসুরকে দেখিলে মুখ আবৃত করা চাই এবং মামাশ্বশুরের নিকটসংস্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা মোটের উপর বর্ণভেদমূলক।...

'ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আত্মীয় সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্য করে কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয়-প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মতো চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।...

'আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই, পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতান্তই আলগা-আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি, এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানে সব-প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহ্য ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত যাহা-তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের যাহাতে সুবিধা সেইটের অনুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ বেশভুষা আদর-অভ্যর্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয়সমাজ নহে সেখানে আত্মীয় সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।'

পথের সঞ্চয়-এর 'খেলা ও কাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর খাসলতের কথা ভেবে লেখেন : 'এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের

লোকে মিলিত হইয়াছে, সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পরি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরস্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। য়ুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট। সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অবারিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনই সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়—সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেটকে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ সুস্পষ্ট থাকাতেই পরস্পর মেলামেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও সুশৃঙ্খল। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের প্রয়োজন-মত চলিতাম। পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহ বা দাঁতন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ রোধ করিয়া নিদ্রা দিতাম, কেহ বা হুঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইত না, এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টামাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া যাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিম্বা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তামাত্র থাকিত না; হঠাৎ দেখা যাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচজনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো তাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে এবং রসিক ব্যক্তি সময় অসময় বিচার না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে—কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্ধ হাজার বার করিয়া খোঁজাখুঁজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যাইত।

'ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারিদিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ-আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজ-কর্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে। যোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার তলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতির সহিত রক্ষা করে। কারণ ইহাই তাহার অস্ত্র; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।'

১৮৯১ সালের জুন মাসে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে বাঙালির অবাধ সামাজিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তারপরে এখানকার সাজাদপুরের ইংরেজি স্কুলের মাস্টারেরা হুজুরের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তারা কিছুতেই উঠতে চায় না, অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না-পাঁচ মিনিট অন্তর দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তার এক আধটা উত্তর পাই, তারপরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি, মাথা চুলকোই—জিজ্ঞাসা করি এবার এখানে শস্য কি রকম হয়েছে। স্কুল-মাস্টাররা শস্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না—ছাত্র সম্বন্ধ যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে। ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম : জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র?' একজন বললে আশি জন। আর একজন বললে, এক শো পঁচাত্তর জন। মনে করলুম দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেঁধে যাবে। কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল। তারপরে, দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাদের মনে পড়ল 'আজ তবে আসি' তা ঠিক বোঝা শক্ত। আর এক ঘণ্টা পূর্বেও মনে হতে পারত; আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত, দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কোনো একটা নিয়ম নেই—অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।'

পথের সঞ্চয়-এর 'সমাজভেদ'-এ ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা করে বাঙালির অবাধ সামাজিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অল্প। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেন না সে আত্মীয় সমাজে নাই। আত্মীয়েরা ক্ষমা করে, সহ্য করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে।...আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত বলিয়াই, পরস্পরের সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের

বন্ধন নিতান্তই আলগা—আমরা যথেচ্ছা জায়গা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি এবং ব্যবহারের বাঁধাবাঁধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানেই সব প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে যাহা ব্যবহারের আপন ইচ্ছামত যাহা তাহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের যাহাতে সুবিধা সেইটের অনুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখাসাক্ষাৎ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বেশভূষা আদর-অভ্যার্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। যাহা বস্তুত আত্মীয় সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের ঢিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবন যাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।'

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ *পশ্চিম-যাত্রীর* ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যদিও শহুরে সভ্যতার পাকে আমাদেরকেও খুব কষে টান দিয়েছে, তবু মনের গ্রাম্য অভ্যেস এখনো যায়নি। সময়কে বলতে আরম্ভ করেছি মূল্যবান, কিন্তু কেউ যদি সে মূল্য গ্রাহ্য না করে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থা আজও তৈরি হয়নি। আমাদের আগন্তুকবর্গ অভিমন্যুর মতো অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে জানেন, কিন্তু নির্গমনের পথ যে তাঁরা জানেন সে তাঁদের ব্যবহারে বোঝা যায় না। অত্যন্ত বেগার লোককেও যদি বলা যায় 'কাজ আছে' সে বলে, 'ঈস! লোকটা ভারী অহংকারী।' অর্থাৎ, 'তোমার কাজটা আমাকে দেখা দেওয়ার চেয়েও মহার্ঘ, এ কথা মনে করা স্পর্ধা।'

'অসুস্থ শরীরে একদিন আমার তিন-তলার ঘরে অর্ধশয়ান অবস্থায় একটা লেখায় নিযুক্ত আছি। আমি নিতান্তই মৃদুস্বভাবের মানুষ বলেই আমার সেই অন্দরের ঘরটাকেও আমার বন্ধু অনতিবন্ধু ও অবন্ধুরা দুর্গম বলে গণ্য করেন না। এইটুকুমাত্র সুবিধা যে, পথটা পুরবাসীদের সকলেরই জানা নেই। খবর এল একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। অস্বাস্থ্য বা ব্যস্ততার ওজরকে আমাদের ভদ্রলোকেরা শ্রদ্ধা করেন না, তাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেখা বন্ধ করে নিচে গেলুম। দেখি, একজন কাঁচা বয়সের যুবক; হঠাৎ তার চাদরের অজ্ঞাতবাস থেকে একটা মোটা গোছের খাতা বেরোল। বুঝলুম, আমারই আপন সম্প্রদায়ের লোক। কবি কিশোর একটুখানি হেসে আমাকে বললে, 'একটা অপেরা লিখেছি।' আমার মুখে বোধ হয় একটা পাংশুবর্ণ ছায়া পড়ে থাকবে, তাই হয়তো আশ্বাস দেবার জন্যে বলে উঠল, 'আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, কেবল গানের কথাগুলোতে সুর বসিয়ে দেবেন, সবসুদ্ধ পঁচিশটা গান।' কাতর হয়ে বললুম, 'সময় কই!' কবি বললে, 'আপনার কতটুকুই বা সময় লাগবে। গান পিছু বড়োজোর আধ ঘণ্টাই হোক।' সময় সম্বন্ধে এর মনের ঔদার্য দেখে হতাশ হয়ে বললুম, 'আমার শরীর অসুস্থ।' অপেরারচয়িতা বললে, 'আপনার শরীর অসুস্থ, এর উপরে আর কী

বলব। কিন্তু যদি—'। বুঝলুম প্রবীণ ডাক্তারের সার্টিফিকেট আনলেও নবীন কবি বিচলিত হবে না। কোনো একজন ইংরেজ গ্রন্থকারের ঘরে এই নাট্যের অবতারণা হলে কোন্ ফৌজদারিতে তার যবনিকাপতন হত, সে কথা মনে করলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

'মানুষের ঘরে 'দরওয়াজা বন্ধ' এ কথাটিও কটু, আর তার ঘরে কোথাও পর্দা নেই এটাও বর্বরতা। মধ্যম পন্থাটাই দেখি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়েই সৃষ্টি, তাদের একান্ত বিচ্ছেদেই প্রলয়, মানুষ নিজের ব্যবহারক্ষেত্রে এইটেই কেবলই ভোলে আর মার খেয়ে মরে।"

ওই একই দিনে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন : 'মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত সুদূরের জীব তা য়ুরোপে আমেরিকায় গেলে বুঝতে পারা যায়। সেখানকার সমাজ হচ্ছে দ্বীপশ্রেণী—ছোটো এক-এক দল জ্ঞাতির চারি দিকে বৃহৎ অজ্ঞাতির লবণসমুদ্র; পরস্পরসংলগ্ন মহাদেশের মতো নয়। জ্ঞাতি শব্দটা তার ধাতুগত বিশেষ অর্থে আমি ব্যবহার করছি; অর্থাৎ, যে কয়জনের মধ্যে জানাশোনা আছে, আনাগোনা চলে; আমাদের দেশে পরস্পর আনাগোনার জন্য জানাশোনার দরকার হয় না। আমরা তো খোলা জায়গায় রাস্তার চৌমাথায় বাস করি। একে আমাদের আয়ু কম, তার উপরে অবাধ সামাজিকতায় পরস্পরের সময় নষ্ট ও কাজ নষ্ট করতে আমাদের সংকোচমাত্র নেই।'

বাঙালির আদবকায়দা ও অবাধ সামাজিকতা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে করেছেন এবং যা আমার চোখে ধরা পড়েছে সেগুলো ওপরে উদ্ধৃত করলাম। বর্তমান বাঙালি সমাজে সময়ের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাধ্য হয়ে অবাধ সামাজিকতায় রাস দিতে হচ্ছে। তবে আদবকায়দায় যেসব ত্রুটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন তা এখনো বিদ্যমান। আদবকায়দার ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রদের একটা সুনাম ছিল। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুনামে দৃশ্যত মূল্যহ্রাস ঘটেছে। 'চুপ বেয়াদব' বলে সেই বেয়াদবি ঠেকানো যায় না। অস্ত্রের ভয়ে বেয়াদবি নিয়ে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে কারো তেমন উৎসাহ নেই। অবশ্য যাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে আদবকায়দায় সামান্য ত্রুটি হলেই রক্তচক্ষু হয়ে তারা উষ্মা প্রদর্শন করে থাকে।

০১ আগস্ট ২০০৩

বাঙালির বাঁধা রীতির বন্ধন

১২৯৯ সালে 'আচারের অত্যাচার'-এ রবীন্দ্রনাথ সমাজের বিধিনিষেধ সম্পর্কে বলছেন—"ইংরেজিতে একটা কথা আছে—'পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ'—বাংলায় তাহার তর্জমা করা যাইতে পারে—কড়ায় কড়া কাহনে কানা। অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। তাহার ফল হয়, 'বজ্র আঁটন ফস্‌কা গিরো'—প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

'আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধি-ব্যবস্থা, আচার-বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

'সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একজন লোক গোরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এই জন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে। আমি যদি অস্পৃশ্য নীচ জাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তি-হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন

করিয়া সেই নীচ জাতির ভিটামাটি উচ্ছন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন। প্রতিদিন রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান, তপ, বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না।

'আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপ ও অপাপ আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

'পাপখণ্ডনেরও তেমনি শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনি যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোট বড় সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজো বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃত দেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমির হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়—আমাদের দেশে তেমনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোট বড় সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বস্ত্র আঁটন তেমন ফস্‌কা গিরো।

'এইরূপে, পাপ-পুণ্য যে মনের ধর্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিয়ে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখো, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে।'

ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, 'জন্তুরা যে স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরেজিতে তাহাকে বলে ইনসটিংক্ট, বাংলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ-সংস্কার। সহজ-সংস্কার, অশিক্ষিত-পটুত্ব, একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ-সংস্কার পশুদের বুদ্ধি মানুষের। সহজ-সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।'

ওই বৎসর 'সমুদ্র যাত্রা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভালো এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

'....শাস্ত্রই যে সকল সময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন। তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

'তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনোরূপ অন্যথা করিয়ে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি-সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না—তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্র-শাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

'তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্তব্যের নিয়ামক কে। শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে। লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে, ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারের অভ্যুদয় হইত না। আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ।... কিন্তু অনধিকারী ইংরেজ আমাদের সমাজকে যে অবস্থায় হাতে পাইয়াছে ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।...

'...এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট জড়-কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণ পথে তিলার্ধমাত্র অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে পারে না।'

ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, 'আমাদের সমাজে কোনো প্রকার স্বাধীনতার কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল, অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোনো ছিদ্র দিয়া

একটুখানি স্বাধীন সূর্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দু সমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না।

'আমরা সমুদ্রপার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্রপার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজবোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পৌঁছতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরেজি শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। আমরা যেন ইংলন্ডে না গেলাম কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সেই তো ভাঙিয়াছে। আজ যে এত বাকচাতুরী, এত শাস্ত্র সন্ধানের ধুম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে তো তাহার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

'কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে, সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত নাই। অতি বড় পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরেজি শিখাইতেছে।

'এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকা-নির্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালি সমুদ্র পার হইবে, পৃথিবীতে সমস্ত উন্নতি-পথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।'

১৩২১ সালের বৈশাখে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'জগতের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতেই জল-বাতাসে এমন একটি অদ্ভুত জাদু আছে যে, এখানে নীতি আপনিই রীতিকে বরণ করিয়া লয়, আচারের পক্ষে বিচারের কোনো প্রয়োজনই হয় না—আমাদের কিছুই বানাইবার দরকার নাই, কেবল মানিয়া গেলেই চলে, এই বলিয়া অভিনন্দন করিতে বসিয়াছি।

'যে লোক কাজের উৎসাহে আছে, স্তবের উৎসাহে তাহার প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রমাণ দেখো, আমরাও পশ্চিম সমুদ্র পারে গিয়া সেখানকার মানুষদের মুখের উপর বলিয়া আসিয়াছি, তোমরা মরিতে বসিয়াছ। আত্মা বলিয়া পদার্থকে কেবলই বস্ত্র চাপা দিয়া তাহার দম বন্ধ করিবার জো করিয়াছ 'তোমরা স্থূলের উপাসক'। এসব কঠোর কথা শুনিয়া তাহারা তো মারমূর্তি ধরে নাই। বরঞ্চ ভালো মানুষের মতো মানিয়া লইয়াছে; মনে মনে বলিয়াছে, 'হবেও বা। আমাদের বয়স অল্প, আমরা কাজ বুঝি; ইহারা অত্যন্ত প্রাচীন, অতএব কাজে কামাই করা সম্বন্ধে ইহারা যে তত্ত্বকথাগুলো বলে নিশ্চয় সেগুলো ইহারা আমাদের চেয়ে ভালোই বোঝে।' এই বলিয়া ইহারা আমাদিগকে দক্ষিণা দিয়া খুশি করিয়া বিদায় করিয়াছে এবং তাহার পরে আস্তিন গুটাইয়া যেমন কাজ করিতেছিল তেমনই কাজ করিতে লাগিয়াছে।

'কেননা, হাজারই ইহাদিগকে নিন্দা করি আর ভয় দেখাই, ইহারা যে চলিতেছে, ইহারা যে প্রাণবান, তাহার প্রমাণ যে ইহাদের নিজেরই মধ্যে। মরার বাড়া গালি নাই, এ কথা ইহাদের পক্ষে খাটে না। ইহারা জানে মরার বাড়াও গালি আছে—বাঁচিয়া মরা। ইহাদের জীবনযাত্রার সংকটের সীমা নাই, সমস্যার গ্রন্থিও বিস্তর, কিন্তু সকলের উপরে ইহাদিগকে ভরসা দিতেছে ইহাদের প্রাণ। এই জন্য ইহারা নিন্দা অনায়াসে সহিতে পারে এবং নৈরাশ্যের কথাটাকে লইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলা করে মাত্র, তাহাতে তাহাদের প্রাণের বেগে আর-একটু উত্তেজনা সঞ্চার করে। আমরাও তেমনি নিন্দা সহজে সহিতে পারিতাম যদি পুরুদমে কাজের পথে চলিতাম।'

বাঙালির নৈষ্কর্ম, নিশ্চলতা ও বিধিনিষেধের অনড়তা সম্পর্কে ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, "নিষ্কর্মণ্য যে তাহারই অহোরাত্র স্তবের দরকার হয়। যে ধনীর কীর্তিও নাই হাতে কোনো কর্মও নাই, চাটুকারের প্রয়োজন সব চেয়ে তাহারই অধিক, নহিলে সে আপনার জড়ত্বের বোঝা বহিবে কেমন করিয়া?... আমাদের সমাজে যে পরিমাণে কর্ম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে সেই পরিমাণে বাহবার ঘটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেখি, সকল বিষয়েই পদে পদে কেবলই বাধে।... বহু পুরাতন যুগ হইতে পুরুষানুক্রমে যত-কিছু বিপদের তাড়না আপনার ভয়ের সংবাদ রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে পুঁথির আকারে বাঁধাইয়া রাখিয়া একটি বৃদ্ধ তাহারই খবরদারি করিতেছে। নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয় জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে 'রোসো রোসো' প্রাণ বলিতেছে 'দেখাই যাক না।'...

'এখানে স্থলের স্থাবরতা ভয়ংকর হইয়া বসিয়া আছে—এ যে পঙ্কেশের শুভ্র মরুভূমি। এখানে এক কালে যখন প্রাণের রস বহিত তখন ইতিহাস সজীব হইয়া, সচল হইয়া, কেবল যে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত তাহা নহে—মহতী স্রোতস্বিনীর মতো দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইত। বিশ্বের সঙ্গে সেই প্রাণবিনিময়ের, সেই পণ্যবিনিময়ের ধারা ও তাহার বিপুল রাজপথ কবে কোন্ কালে বালু চাপা পড়িয়া গেছে। এখানে সেখানে মাটি খুঁড়িয়া বাহনদের কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পুরাতত্ত্ববিদের খনিত্রের মুখে পণ্যসামগ্রীর দুটো-একটা ভাঙা টুকরা উঠিয়া পড়ে। গুহা-গহ্বরে গহনে সেকালের শিল্পপ্রবাহিণীর কিছু কিছু অংশ আটকা পড়িয়া গেছে; কিন্তু আজ তাহা স্থির, তাহার ধারা নাই। সমস্ত স্বপ্নের মতো মনে হয়। আমাদের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ কী? সমস্ত সৃষ্টির স্রোত বন্ধ। যাহা আছে তাহা আছে, যাহা ছিল তাহা কেবলই তলাইয়া যাইতেছে।...

'মৃত্যু যে প্রাণের ছোটো ভাই: আগে প্রাণ, তাহার পরে মৃত্যু।... অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি, জগতে আমাদের মতো সনাতন আর কিছুই নাই। কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে, সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

'পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।... কিন্তু পৃথিবীতে যে কোনো শক্তিই মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাঁবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে—সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐসকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। মানা, মানা, মানা—ওইতে বসিতে কেবলই তাহাদিগকে মানা মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার কোনো কারণ নাই, যুক্তি নাই, তাহাকে মানাই যাহাদের নিয়ত অভ্যাস, মানিয়া চলা তাহাদের এমনি আশ্চর্য দুরন্ত হইয়া উঠে যে, যেখানে কাহাকেও মানিবার নাই সেখানে তাহারা চলিতেই পারে না। এই প্রকার হতবুদ্ধি হতোদ্যম মানুষকে আপন তর্জনিসংকেতে ওঠ্‌বোস্ করানো সহজ। আমাদের সমাজ সমাজের মানুষগুলাকে লইয়া এই প্রকারের একটা প্রকাণ্ড পুতুল-বাজির কারখানা খুলিয়াছে। তারে তারে আপাদমস্তক কেমন করিয়া বাঁধিয়াছে, কী আশ্চর্য তাহার কৌশল! ইহাকে বাহবা দিতে হয় বটে। বিধাতাকে এমন সম্পূর্ণরূপে হার মানানো, প্রাণীকে এমন কলের পুতুল করিয়া তোলা জগতে আর কোথায় ঘটিয়াছে?...

'স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে যাহারা সর্বাগ্রে চলার পথে ছুটিত, তাহারাই পথের মধ্যে প্রাচীর তুলিবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া থাকে। কাজ করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম, কিন্তু কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগে।

'ইঁহারা কুন্তীসুত কর্ণের মতো। পাণ্ডবের দলে কর্ণের যথার্থ স্থান ছিল, কিন্তু সেখানে অদৃষ্টক্রমে কোনো অধিকার না পাওয়াতে পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল।...

'ইঁহারা তাল ঠুকিয়া বলেন, স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে! আক্ষেপ করিয়া বলেন, 'আমাদের প্রভুদের মানা আছে বলিয়াই আমরা পৌরুষ দেখাইতে পারি না।' অথচ সমাজের চোখে ঠুলি দিয়া তাহাকে সরু মোটা হাজার বাঁধনে বাঁধিয়া মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে জুড়িয়া, একই চক্রপথে ঘুরাইবার সব চেয়ে বড়ো ওস্তাদ ইঁহারাই। বলেন, এই ঘানি সনাতন, ইহার পবিত্র স্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু একেবারে শান্ত হইয়া যায়। ইঁহারা প্রচণ্ড তেজের সঙ্গেই দেশের তেজ-নিবৃত্তির

জন্য লাগিয়াছেন; সমাজের মধ্যে কোথাও কিছু ব্যস্ততার লক্ষণ না দেখা দেয়, সেজন্যই ইঁহারা ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।'

২১ মার্চ ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ শ্রী দিলীপকুমার রায়কে বলছেন, 'বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ, তাই বাঙালির রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। এই জেনারেশ্যানের কাছ থেকে হয়তো খুব বেশি কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরবর্তী কালকে দাবিয়ে রাখবে কে? এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী করে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নাচ, গান এদের কি কিছু দাম নেই। আনন্দকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখে এমন কি চতুর্থবর্গ ফল লাভ হবে বুঝি নে। দেশের অস্থিমজ্জায় আনন্দকে চারিয়ে তোলো, তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে, এমন কি রাজনীতির দিক থেকেও।...'

৬ জুলাই ১৯৩৫ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলা সংস্কৃতির যদি অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য থাকেই তবে সেটা কি পুরাতনের পুনরাবৃত্তিরূপেই প্রকাশিত হতে থাকবে? কখনই না, কারণ অপরিবর্তনীয় পুনরাবৃত্তি তো প্রাণধর্মের বিরুদ্ধ। সেকেলে কবির গানে পাঁচালি প্রভৃতিতে বাঙালী রুচির একটা আদর্শ নিশ্চয়ই পাওয়া যায় কিন্তু কালক্রমে তার কোন পরিণতি যদি না ঘটে তবে বলতে হবে সে আদর্শ মরেছে। শিশুকে বড়ো হতে হবে, সেই পরিবৃদ্ধির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্র বরাবর থাকে কিন্তু অন্তরে বাইরে বদল হয় বিস্তর। তার সজীব কলেবরটা বাহিরের নানা উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে, নতুন নতুন অবস্থার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে চলে, নতুন পাঠশালায় নতুন নতুন শিক্ষালাভ করে। তার প্রভূত পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটে কিন্তু মূল প্রাণের সূত্র যার দুর্বল, পুনরাবৃত্তি বই তার আর কোনো গতি নেই। সেই পুনরাবৃত্তির অভাব দেখলেই প্রথার দোহাই পাড়তে থাকে যে বুদ্ধি সে শবাসনা।'

১৩২৪ সালের ভাদ্রে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এইজন্য যে দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।'

ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই

শক্তিলাভ, সমৃদ্ধিলাভ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ—এই নিশ্চিতবোধটাই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এত বড়ো মুক্তি।

'আমরা কিন্তু দুই হাত উল্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

'কালেজি পাঠক বলিবেন, 'আমরা তো এসব মানি না। আমরা তো বসন্তের টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলে পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন-কি মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি'—এবং 'সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি'!

'মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ওই মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলই বলে, কী জানি, কাজ কী! ভয় জিনিসটাই এই রকম।... আমরাও অন্ধ ভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাস করি, 'কর্তার ইচ্ছা কর্ম' এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না।'

১৩৩২ সালে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ'-এ আচারের বিধিনিষেধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছেন তা বাঙালি হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য : 'এ সমাজ বিচারকে শ্রদ্ধা করতে সাহস করে নি; আচারকেই একান্তভাবে অবলম্বন করেছে; প্রধানত এর বন্ধন আভ্যন্তরিক স্নায়ু শিরার নয়, বাহ্যিক জোড়াতাড়ার। এইজন্যেই নড়াচড়ার সম্বন্ধে এর এত বেশি সতর্কতা। বাহিরের বন্ধনের গ্রন্থি পাছে বাহিরের একটু মাত্র আঘাতে খুলে যায় এইজন্যেই বাহিরকে সে এত বেশি ভয় করে। এই সতর্কতা আর তো খাটে না। সমুদ্রের এপারের লোককে ওপারে যেতে আটকানো যায় কিন্তু ওপারের লোক যখন এপার এসে পড়ে তখন কী করা যাবে? নূতন শিক্ষা, নূতন মত, নূতন অভ্যাস বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো ভারতের উপর আছড়ে

পড়েছে। যে-সব বিশ্বাস ছিল তার সমাজের স্তম্ভ, সে-সব বিশ্বাসে প্রতিদিনই ছোট-বড় ছিদ্র দেখা দিচ্ছে। মত বিশ্বাসের এই পরিবর্তন হোলো ভিতরকার কথা, কিন্তু বাইরের দিকের প্রবল আক্রমণটা আর্থিক। অন্ন-সচ্ছলতা না থাকলে বহুসম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজের নিয়ম কখনই পালিত হোতে পারে না। পর-সমাজের মত-বিশ্বাসের স্রোত যেমন নিয়তই আমাদের চিত্তের উপর এসে পড়েছে, আমাদের অন্নের স্রোতও তেমনি নানা শাখায় পর-দেশের দিকে ছুটেছে। এখন এদেশের মানুষ খুব কড়াকড় করেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বিচার করতে বাধ্য হোলো। প্রত্যেক গৃহের সামাজিক পরিধি দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে আসছে। তাই একদিন এ সমাজে যে-সকল মনোভাবচর্চার বিচিত্র অবকাশ ছিল, এখন তা না থাকাতে সে সকল মনোভাব নির্জীব প্রায়। অথচ সমাজের কাঠামো এখনো সম্পূর্ণ বদ্‌লে যেতে পারে নি। সেই জন্যে আজকাল আমরা সমাজের সমস্ত বাধাকেই বহন করছি, অথচ লক্ষ্যকে স্বীকার করতে পারছি নে। এই কারণে এই প্রভূতবাধাগ্রস্ত সমাজে মানুষের পরাভবের আর অন্ত নেই। আমাদের পরিবারবন্ধন সকলের চেয়ে সাংঘাতিক বন্ধন হয়ে উঠেছে। তার বহু বিচিত্র জটিল জালে মানুষকে বিশ্বক্ষেত্র থেকে সে নিরস্ত করে জড়িয়ে রেখেছে। আমরা যতই বেশি পারিবারিক হয়ে উঠছি ততই বিশ্বব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছি। কেন না, আজকালকার দিনে যারা নিছক ঘরের ছেলে, তারা কেবলি হটে যাবে। আমরা একদিন ঘর ছাড়ব বলেই ঘর ফেঁদেছিলুম। আজ আমরা আর সমস্তই ছেড়েছি কেবল ঘরখানাই আছে। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় যারা, তারা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করে, অবশেষে তাদের শক্তিই তাদের স্বাতন্ত্র্যের ঘাড়ে চেপে বসে। আমাদের দেশে তাই ঘটেছে, আমরা মুক্তির প্রেমে বন্ধনকে মেনেছিলুম আজ বন্ধনের প্রেমে মুক্তিকে খুইয়ে বসেছি।'

১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠে এক সাহিত্য সমালোচনায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে একটি প্রশ্ন করেন :

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় : 'সামাজিক প্রাণী হিসাবে সাহিত্যিকের সামাজিক বিধিব্যবস্থাকে ভাঙবার কতটা অধিকার আছে আপনি বিচার করবেন।'

রবীন্দ্রনাথ : 'সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যেমন এক সময় আমাদের দেশে একান্নবর্তী ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি শিথিল হয়েছে। সমাজব্যবস্থার যখন পরিবর্তন হয়, সে পরিবর্তন যে কারণেই হোক—ধর্মনৈতিক কারণেই যে সব সময় হয় তা নয়, অধিকাংশ স্থলে অর্থনৈতিক কারণেও হয়—তখন একটি কথা ভাববার আছে। তৎকালীন যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবল ছিল, যার প্রয়োজন ছিল, তখন সেগুলোকে রক্ষা করবার জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ পাকা করে দেওয়া হয়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে প্রয়োজন চলে যায়, অথচ নিয়ম শিথিল হতে চায় না।

সমাজ অন্ধভাবেই আপন নিয়ম আঁকড়ে থাকে। সে বলে, যে কারণেই হোক, একটাও নিয়ম আলগা হলেই সব নিয়মের জোর চলে যায়। সকল মানুষই সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি খাটাবার অধিকার দাবি করলে সমাজ টিকতে পারে না। সমাজের পক্ষে এই কথা। সাহিত্য সমাজের এই সতর্কতাকে সম্মান করে না। সর্বকালের নীতির দিকে তাকিয়ে সাহিত্য অনেক সময় তাকে বিদ্রূপ করে তার বিরুদ্ধবাক্য বলে। অবশ্য সমাজের এমনও অনেক বিধি আছে যার আয়ু অল্প নয়। রীতির চেয়ে নীতির উপরে যার ভিত্তি। যেমন আমাদের হিন্দু-সমাজে গোহত্যা পাপ বলে গণ্য, অথচ সেই উপলক্ষে মানুষ-হত্যা ততদূর পাপ বলে মনে করি না। মুসলমানের অন্ন খেয়েছে বলে শাস্তি দিই, মুসলমানের সর্বনাশ করেছে বলে শাস্তি দিই নে। সমাজব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু, যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না, ইত্যাদি, সেগুলোর ব্যতিক্রম কোনোকালে হতে পারে বলে মনে করি না।'

১৩৩৬ সালের কার্তিকে 'সাহিত্য বিচার'-এ বাঁধা রীতির বন্ধন রবীন্দ্রনাথ বললেন, '...আমাদের দেশ জাতমানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়ো লোক বলি যার বড়ো পদ, বড়ো মানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণীর চাপ, দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পঙ্‌ক্তিপূজক সমাজে তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই।"

১৩৩৭ সালের ফাল্গুনে 'পল্লীপ্রকৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যারা মা-ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়; কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি পরস্পরের মধ্যে ঠিকমত সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমত পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।'

তিনি ওই প্রবন্ধে আরো বলেন, 'আমাদের দেশে আমরা পরবাসী—অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়।'

১৩৪০ সালের শ্রাবণে *কালান্তর*-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'পাঠশালার পথ দিয়ে বিজ্ঞান এসেছে আমাদের দ্বারে, কিন্তু ঘরের মধ্যে পাঁজিপুঁথি এখনো তার সম্পূর্ণ দখল ছাড়ে নি।'

৩০ জানুয়ারি ২০০৪ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

বাঙালির দারিদ্র্য

বাঙালির দারিদ্র্য, দারিদ্র্যমোচন ও দারিদ্র্যরোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেসব মতামত প্রকাশ করে গেছেন তা আজও আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

১৩৩৮ সালের আশ্বিনে *পল্লীপ্রকৃতি*-র 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে সাংঘাতিক প্লাবন, অক্ষমতার প্লাবন, ধনহীনতার প্লাবন। এ দেশের ধনীরা ঋণগ্রস্ত, মধ্যবিত্তরা চির দুশ্চিন্তায় মগ্ন, দরিদ্রেরা উপবাসী। তার কারণ, এ দেশের ধনের কেবলই ভাগ হয়, গুণ হয় না।

'আজকের দিনের পৃথিবীতে যারা সক্ষম তারা যন্ত্রশক্তিতে শক্তিমান। যন্ত্রের দ্বারা তারা আপন অঙ্গের বহুবিস্তার ঘটিয়েছে, তাই তারা জয়ী। এক দেহে তারা বহুদেহ। তাদের জনসংখ্যা মাথা গুণে নয়, যন্ত্রের দ্বারা তারা আপনাকে বহুগুণিত করেছে। এই বহুলাঙ্গ মানুষের যুগে আমরা বিকলাঙ্গ হয়ে অন্য দেশের ধনের তলায় শীর্ণ হয়ে পড়ে আছি।

'সংখ্যাহীন উমেদারের দেশে কেবল যে অন্নের টানাটানি ঘটে তা নয়, হৃদয়ের ঔদার্য থাকে না। প্রভুমুখপ্রত্যাশী জীবিকার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ কণ্টকিত হয়ে উঠে। পাশের লোকের উন্নতি সইতে পারি নে। বড়োকে ছোট করতে চাই। একখানাকে সাতখানা করতে লাগি। মানুষের যে-সব প্রবৃত্তি ভাঙ্গন ধরাবার সহায় সেইগুলিই প্রবল হয়। গড়ে তোলবার শক্তি কেবলই খোঁচা খেয়ে খেয়ে মরে।...

'বহুকাল থেকে আমরা কলম হাতে নিয়ে একা কাজ করে মানুষ—যারা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, আজ ডাইনে বাঁয়ে কেবলই তাদের রাস্তা ছেড়ে

দিয়ে চলি, নিজের রিক্ত হাতটাকে কেবলই খাটাচ্ছি পরীক্ষার কাগজ, দরখাস্ত এবং ভিক্ষার পত্র লিখতে।

'...একদিন বাঙালি শুধু কৃষিজীবী এবং মসীজীবী ছিল না। ছিল সে যন্ত্রজীবী। মাড়াই-কল চালিয়ে দেশ-দেশান্তরকে সে চিনি জুগিয়েছে। তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।

'অবশেষে আরও বড়ো যন্ত্রের দানব-তাঁত এসে বাংলার তাঁতকে দিলে বেকার করে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাষ করে মরছি—মৃত্যুর চর নানা বেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসল।

'তখন থেকে বাংলাদেশের বুদ্ধিমানদের হাত বাঁধা পড়েছে কলমচালনায়। ঐ একটি মাত্র অভ্যাসেই তারা পাকা, দলে দলে চলেছে আপিসের বড়োবাবু হবার রাস্তায়। সংসারসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে কলম আঁকড়িয়ে থাকে, পরিত্রাণের আর-কোন অবলম্বন চেনে না। সন্তানের প্রবাহ বেড়ে চলে, তার জন্যে যারা দায়িক তারা উপরে চোখে তুলে ভক্তিভরে বলে, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

'আহার তিনি দেন না, যদি স্বহস্তে আহারের পথ তৈরী না করি। আজ এই কলের যুগে কলই সেই পথ।

'অর্থাৎ প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডারে যে শক্তি পুঞ্জিত তাকে আত্মসাৎ করতে পারলে তবেই এ যুগে আমরা টিকতে পারব।

'এ কথা মানি-যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মতো সে বিষও উদ্গার করে। পশ্চিম-মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসছে। তা ছাড়া, অসৌন্দর্য, অশান্তি, অসুখ, কারখানার অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যেরই সামিল হয়ে উঠল। কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তিসম্পদকে দোষ দেব না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান; তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেছে, কিন্তু সেইসঙ্গে যন্ত্রকে সুদ্ধ টান মারেনি। উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম করে দিয়ে লোভের কারণটাকে সে ঘুচিয়ে দিতে চায়।'

১৩১৯ সালের আষাঢ়ে *পথের সঞ্চয়*-এর 'বোম্বাই শহর'-এ রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ের লোকের ধনশালিতার সঙ্গে কলকাতার দৈন্যের তুলনা করে বলেন, 'প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে মধু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া

তাহারা আপিসে যাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষার যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে, আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে জাগ্রত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে, কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেরজাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্য; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃশ্য দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা শৈথিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অসাড়তাবশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

'আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে; এইজন্য তাহা বড়ো ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মতো; তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না; তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীরুতা দেখি। মারোয়াড়ি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাঁদার খাতা আমাদের দেশের গোরুর মতো—তাহার চরিবার স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল, অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।'

১৩২৯ সালের ফাল্গুনে 'সমবায়-২'-এ দারিদ্র্যমোচন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট মত প্রদান করেন : 'ধর্মের উপদেশ ব্যর্থ হয়েছে বলেই, সকল সমাজেই

ধন ও দৈন্যের দ্বন্দ্ব একান্ত হয়ে রয়েছে বলেই, যাঁরা এই অকল্যাণকর ভেদকে সমাজ থেকে দূর করতে চান তাঁদের অনেকেই জবরদস্তির দ্বারা লক্ষ্যসাধন করতে চান। তাঁরা দস্যুবৃত্তি করে, রক্তপাত করে, ধনীর ধন অপহরণ করে সমাজে আর্থিক সাম্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত চেষ্টা বর্তমান যুগে পশ্চিম মহাদেশে প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে পশ্চিমের মানুষের গায়ের জোরটা বেশি, সেইজন্যেই গায়ের জোরের উপর তার আস্থা বেশি; কল্যাণসাধনেও সে গায়ের জোর না খাটিয়ে থাকতে পারে না। তার ফলে অর্থও নষ্ট হয়, ধর্মও নষ্ট হয়। রাশিয়ায় সোভিয়েট-রাষ্ট্রনীতিতে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

'অতএব ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানবসমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়। মানুষকে দেখানো চাই যে, বড়ো মূলধনের সাহায্যে অর্থসম্ভোগকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমার মধ্যে একান্ত আটকে রাখা সম্ভব হবে না। আজকের দিনে যদি কোনো ক্রোরপতি উটের ডাক বসিয়ে কেবলমাত্র তাঁর নিজের চিঠি-চালাচালির বন্দোবস্ত করতে চান তা হলে সামান্য চাষার চেয়েও তাঁকে ঠকতে হবে: অথচ পূর্বকালে এমন একদিন ছিল যখন ধনীরই ছিল উটের ডাক, আর চাষীর কোনো ডাক ছিল না। সেদিন ধনীকে তাঁর গুরুঠাকুর এসে যদি ধর্ম উপদেশ দিতেন তবে হয়তো তিনি তাঁর নিজের চিঠিপত্রের সঙ্গে গ্রামের আরও কয়েকজনের চিঠিপত্রের ভারবহন করতে পারতেন, কিন্তু তাতে করে দেশে পত্রচালনার অভাব প্রকৃতভাবে দূর হতে পারত না। সাধারণের দারিদ্র্য-হরণের শক্তি ধনীর ধনে নেই।

'সে আছে সাধারণের শক্তির মধ্যেই। এই কথাটা জানা চাই, এবং তার দৃষ্টান্ত, সকলের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া চাই। কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জনশক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে তার মূল্য ব্যক্তিবিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশি। এইটি দেখাতে পারলেই তবে মূলধনকে নিরস্ত্র করা যায়, অস্ত্রের জোরে করা যায় না। মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।'

২৩ আগস্ট ১৯২৭ *সাহিত্যের পথে*-এর 'সাহিত্যে নবত্ব'-এ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনার কথা আলোচনা করেন : "বিলিতি পাকশালায় ভারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি পাউডার বাঁধা নিয়মে তৈরি করে রাখে; যাতে-তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে—লঙ্কার গুঁড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোঝা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে

সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারিপাউডার'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।

'অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্যবেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে—যখন-তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। 'আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে লাইফ', এই আস্ফালন করবার মধ্যে অনেকেই দেখা যায় নিজেদের জীবনযাত্রায় 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর ভোগের ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই রাখেন নি—ভালোরকম উপার্জনও করেন, সুখে-স্বচ্ছন্দেও থাকেন—দেশের দারিদ্র্যকে এঁরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই ঝাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি-পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এইজন্যেই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।"

রবীন্দ্রনাথের উক্ত বক্তব্যের জন্য নজরুল ইসলামসহ অনেক বামপন্থি লেখক তাঁকে সমালোচনা করেন।

১৩১৯ সালের আষাঢ়ে *পথের সঞ্চয়*-এর 'যাত্রার পূর্বপত্র'-এ বাঙালির দাবিকৃত আধ্যাত্মিকতা ও দারিদ্র্যভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই; এই জন্যই বহির্বিষয়েই আমরা দুর্বল হইয়াছি। বাহিরের দৈন্য সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাকে এমনি করিয়া আমরা খর্ব করিতে চাই। আমাদের অনেকেই মুখে আস্ফালন করিয়া বলিয়া থাকেন, দারিদ্র্যই আমাদের ভূষণ।

'ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ। যে ভূষণের কোনো মূল্য নাই তাহা ভূষণই নহে। এইজন্য ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে; শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া নিয়ত অবসাদে মলিন, যাহারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া যাহারা বারবার ধুলায় লুটাইয়া পড়ে, দরিদ্র বলিয়াই যাহারা সুযোগ পাইলে অন্য দরিদ্রকে শোষণ করে এবং অক্ষম বলিয়াই ক্ষমতা পাইলে যাহারা অন্য অক্ষমকে আঘাত করে, কখনোই দারিদ্র্য তাহাদের ভূষণ নহে।'

৭.১১.০৩

বাঙালির দৈন্যদুর্বলতা

২৫ নভেম্বর ১৮৯৫/১০ অগ্রহায়ণ ১৩০১ সালে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনের দৈন্যদশার কথা বলছেন, 'এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে মুক্তভাবে আনন্দে সঞ্চরণ করে বেড়াবার অধিকার বিধাতা বাঙালির ছেলেদের দেন নি—আমরা সব গোয়ালের গোরু, বড়োজোর গ্রামের মাঠ পর্যন্ত আমাদের চরে বেড়াবার সীমা—তাও সর্বদাই রাখালবালক লাঠি হাতে পিছন-পিছন লেগেই থাকে। কাল সন্ধেবেলায় গেটের ওপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম—তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী এক অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কী একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায়নি, শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে। মনে হয়—যদি গেটের মতো শুভাদৃষ্ট আমার হতো, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তা হলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র, দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব—এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।'

১৩১৫ সালে *পথ ও পাথেয়*-তে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির দুর্বলতা সম্পর্কে বলেন, 'যে দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, প্রলয়ের আঘাতকে সে

কখনোই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই, তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্রা ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

'পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হু হু করিয়া চলিয়া গেল, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আর কিছু না হউক সে জাহাজের খোলের তক্তাগুলোর মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্বে ছিল এমন হয়, তবে নিশ্চয়ই কোনো-এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে বসিয়া সেগুলো সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আলগা তক্তার উপরে আর-একটা আলগা তক্তা ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিতে থাকে, ওই দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিস নয়। আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি। ভিতরে যখন এমন-সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া, ঢেউ বাঁচাইয়া, স্বরাজ্যের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উদ্দীপনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়।

'বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি, তখন আমাদের দেশের কোনো দুর্বলতা কোনো ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুধুমাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে, এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এইপ্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর-কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না। অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি, সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিম্বা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

'এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, তখন তাহার মতো মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরমদুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।'

১৩১৯ সালে *পথের সঞ্চয়*-এর 'যাত্রার পূর্বপত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না, দেশ যাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতায় তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার দুর্বলতাই ব্যক্ত করে।

'তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই—মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া? মা আপন গর্ভের সন্তানকেও অহরহ সেবাদুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। যাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারি দিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।'

১৩১৯ সালে *পথের সঞ্চয়*-এর ওই প্রবন্ধে বাঙালির দুঃখ স্বীকার করার যে বল নেই সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখ স্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

'দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সদ্‌গতির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখব্রত গ্রহণ করে,

মুক্তিলোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখসাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্যকেই প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের ঊর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তোলে।

'এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ দুঃখ স্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।'

২৮ আগস্ট ১৯২০ স্বজাতির দৈন্য সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোনো ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা আমাদের মনকে সেই ব্যথার কালের বাইরে যেতে বাধা দেয়—সেই ব্যথা বর্তমানে খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে। সেই হচ্ছে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানলা খোলা নেই। সেই হচ্ছে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘরমাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই।

'আধুনিক ভারতবর্ষের লোক অতি ক্ষুদ্র বর্তমানের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। তার দীনতা এত বেশি যে বর্তমানের সব দাবীও সে পুরাপুরি মেটাতে পারচে না। সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্যে তার দিন চল্‌চেনা, ঋণের প্রত্যাশায় সে ধনীর দ্বারে ধন্না দিয়ে বসে আছে। কিন্তু যার বর্তমানের সম্বল স্বল্প সে আপনার ভবিষ্যৎকে বাঁধা দিয়ে তবে ঋণ পায়—আমরা যতই পরের কাছে হাত পাতছি ততই নিজের ভবিষ্যৎকেই বিকিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বর্তমান সঙ্কীর্ণ, আমাদের সম্মুখে ভবীকাল বাধাগ্রস্ত, এইজন্যেই আমাদের মন বড় করে ভাবতে পারচেনা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করচে। তুমি তোমার কলেজের ছাত্রদের কলুষ সম্বন্ধে যা লিখেচ তার কারণ হচ্ছে মন যখন মুক্তির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে পাপের উত্তেজনা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে শুনেচি যে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের সতীর্থ ছাত্রীদের অপমানিত করবার জন্যে ক্লাসের বোর্ডে অতি কুৎসিত কথা লিখে রাখে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে সকল পরিবার থেকে এই সব ছাত্র আসে তারা আত্মার দীনতা দ্বারা পীড়িত। মন যেখানে কেবলি ছোট ভাবনা ভাবতে বাধ্য, ছোট কর্ম করতে নিযুক্ত, সেইখানে এই আত্মার দীনতা ঘটে। সঙ্কীর্ণ ঘর যদি বন্ধ হয় তাহলে

বাতাসে দূষিত হয়ে ওঠে।' 'কালোহয়ং নিরবধিঃ' আমাদের পক্ষে সত্য নয়, 'বিপুলাচ পৃথ্বীঃ' সেও আমাদের পক্ষে মিথ্যা।"

২৮ জুলাই ১৯৩৬ অমিয় চৌধুরীকে এক পত্রে স্বজাতিকে এক আত্মঘাতী জাতি হিসেবে শনাক্ত করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা মার খাবার জন্যেই অতি বিশুদ্ধভাবে তৈরি করেছি নিজেকে। আমরা কিমা-করা মাংস, বাঁচবার জন্যে নই, গলাধঃকৃত হবার জন্যেই। আমাদের শতধাবিভক্ত জীর্ণ জনসমাজ কোনো আগন্তুক অকল্যাণকে এ পর্যন্ত ঠেকাতে পারে নি। আমরা আত্মঘাতী জাত, বাহির থেকে মারের নানা পথ নিজের হাতে সনাতনী নৈপুণ্যে পাকা করে বাঁধিয়ে রেখেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পরাভব হতে হতেও তা নিয়েই শ্লাঘা ক'রে থাকি। মারটাই কেবল পেয়ে এসেছি তার থেকে শিক্ষা পাই নি। ইতিহাসে আমাদের চেয়ে মজবুৎ অনেক জাত মরেছে—আমরাই যে আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা ও অস্বাস্থ্যের কারণগুলোকে সযত্নে সর্ব্বদেহেমনে পোষণ ক'রেও বেঁচে থাকব, আমরা বিধাতাপুরুষের এত বড়ো আদুরে ছেলে নই। পরের অনুকম্পার পরেই আমাদের পরিত্রাণ যদি নির্ভর করে তবে এই অনুকম্পা লাভের জন্যেও শক্তির প্রয়োজন আছে। সেই শক্তির দ্বারা ভিক্ষার লাঘবতা অনেকটা দূর হয়। দুর্ব্বলের অহঙ্কার অত্যন্ত হেয়। সেই ক্লীব অহঙ্কার নিয়ে জোর গলায় আজকাল হুঙ্কার দিয়ে বলি, করব না ভিক্ষে, নিজের জোরেই দাবী সার্থক করব। ভালো কথা, কিন্তু হায় রে, জোরভাঙা সমাজে সেই নিজের জোরটা কোন্‌খানে? যত জোর আপনজনকে গালাগালি করতে, পরস্পরকে খর্ব্ব করতে, দলাদলি দ্বারা দলিত করতে দেশের ইষ্ট! যত জোর কেবল কি গলাতেই, যতক্ষণ না সেই গলা বাহির থেকে প্রবলমুষ্টি এসে চেপে ধরে?'

১৩১৩ সালে বাঙালির নকলেপনা সম্পর্কে 'শিক্ষাসমস্যা'-য় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই—নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না।'

ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংস্কারে ধনী য়ুরোপের অনুকরণ না করে সম্বল অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন, 'আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই, তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই

গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো-আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নিচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায় অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না।'

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে দৈন্য বিরাজ করতো সে সম্পর্কে ১৩২২ সালের কার্তিকে হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত 'পল্লীর উন্নতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায় উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে। ...আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।'

২৪ অক্টোবর ২০০৩

বাঙালির কাজের ধারা

বাঙালির কাজের মধ্যে অযথার্থতা, অস্থিরতা এবং নিয়ম ও সুযোগ বুঝে কাজ না করার প্রবণতা লক্ষ করে সেসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছেন। ১২৯৪ সালে 'হিন্দুবিবাহ'-এ তিনি বলেন, 'যাহারা কোন কর্তব্য সমাধা করিতে চাহে না তাহারা এক কর্তব্যের কথা উঠিলেই দ্বিতীয় কর্তব্যের কথা তুলিয়া মুখচাপা দিতে চায়। আমরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং অতিশয় দূরদৃষ্টি ও সম্পূর্ণ সাবধানতাসহকারে দেশের সমস্ত অভাব এবং বিঘ্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সমালোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাকা চাল চালিতে চাহি, যাহাতে একই সময়ে সকল দিকে সকল প্রকার সুবিধা করিতে এবং সজোরে 'কিস্তিমাত' উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হইতে যাবজ্জীবন নির্বিঘ্নে তামাক এবং তাকিয়া সেবন করিবার অখণ্ড অবসরপ্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান বাঙালি হইলেও ঠিক এমন সুযোগটি সংঘটন করিতে পারিব না। এমনকি, আমাদিগকেও ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কর্তব্য সাধন করিতে হইবে।'

১২৯৮ সালে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'-এ তিনি বলেন, 'আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখতে শিখিনি, ভাবতে শিখিনি, কাজ করতে শিখিনি, সেই জন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই—আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মতো মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মতো ঝরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেই জন্য আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের এসের মতো, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে, জীবনের ব্যবহারের জন্যে নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাংকুরের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই।'

১৩০২ সালে 'বিদ্যাসাগরচরিত'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি

না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ছুরি পরিমাণ বাক্যব্যয় করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।'

১৩১৩ সালের ফাল্গুনে 'সাহিত্য সম্মিলন'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সকল দেশেরই মহত্ত্বের ইতিহাসে যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর তাহা দাঁড়াইয়া আছে কিসের উপরে? যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর নহে তাহারই উপর। আমরা যখন নকল করিতে বসি তখন সেই দৃষ্টিগোচরটাই নকল করিতে ইচ্ছা যায়; যাহা চোখের আড়ালে আছে তাহা তো আমাদের মনকে টানে না। এ কথা ভুলিয়া যাই, যাহাদের নামধাম কেহই জানে না দেশের সেই শতসহস্র অখ্যাত লোকেরই নিজের জীবনে অখ্যাত কাজগুলি দিয়া যে স্তর বাঁধিয়া দিতেছে তাহারই উপরে নামজাদা লোকের বড়ো বড়ো ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে। এখন যে আমাদিগকে ভিত কাটিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে—সে ব্যাপারটা তো আকাশের উপরকার নহে, তাহা মাটির নিচেকার—তাহার সঙ্গে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলের তুলনা করিবার কিছুই নাই। গোড়ার সেই গভীরতা, তার পরে উচ্চতা। এই গভীরতার রাজ্যে স্পর্ধা নাই, ঘোষণা নাই; সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন এবং আত্মত্যাগ। এই-সমস্ত ভিতের কাজে, মাটির সংস্রবের কাজে আমাদের মন উঠিতেছে না; আমরা একদম চূড়ার উপর, জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাই। স্বয়ং বিশ্বকর্মাও তেমন করিয়া বিশ্বনির্মাণ করেন নাই। তিনিও যুগে যুগে অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

'তাই বলিতেছি, সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা অন্ন-উপার্জন জ্ঞান শিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার-হাজার লোক মাটির নিচেকার শিকড়ের মতো প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে-সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলফলের প্রাচুর্য। এই গোড়াকার অত্যন্ত সাধারণ কাজগুলির মধ্যে যে কোনো একটা কাজ করিয়া তোলাই যে আমাদের পক্ষে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে শিখাইতে হইবে, তাহার উদ্‌যোগ করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়; খাওয়াইতে হইবে, তাহার সংগতি নাই; রোগ দূর করিতে হইবে, সাহেব এবং বিধাতার উপর

ভার দিয়া বসিয়া আছি। মাটসীনি গারিবাল্ডি হ্যাম্পডেন ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড়ো কাজ তাহা নহে; তাহার পূর্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমশায়, পাড়ার মুরুব্বি, চাষাভুষার সর্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্ট একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব।'

১৩১৩ সালের চৈত্রে 'সাহিত্য পরিষৎ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায় তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি যখনই আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই—সে বাধা আমরা নিজেরা, আমরা প্রত্যেকে। যে কাজকে আমরা আমাদের কাজ বলিয়া বরণ করি তাহাকে আমরা কেহই আমার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনো শিখি নাই। সেই জন্য আমরা সকলেই পরামর্শ দিতে অগ্রসর হই, কেহই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই না; ত্রুটি দেখিলে কর্মকর্তার নিন্দা করি, অকর্মকর্তার অপবাদ নিজের উপর আরোপ করি না; ব্যর্থতা ঘটিলে এমনভাবে আস্ফালন করি যেন কাজ নিষ্ফল হইবে পূর্বেই জানিতাম এবং সেই জন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্বক নির্বোধের উদ্‌যোগে যোগ দিই নাই। আমাদের দেশে জড়তা লজ্জিত নহে, অহংকৃত; আমাদের দেশে নিশ্চেষ্টতা নিজেকে গোপন করে না, উদ্‌যোগকে ধিক্কার দিয়া এবং প্রত্যেক কাজের খুঁত ধরিয়া সে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চায়। এই জন্য আমাদের দেশে এ দৃশ্য সর্বদাই দেখিতে পাই যে, দেশের কাজ একটিমাত্র হতভাগ্য টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, হাওয়া এবং স্রোত দুই উল্টা এবং দেশের লোক তীরে বসিয়া দিব্য হাওয়া খাইতে খাইতে কেহ বা প্রশংসা করিতেছে, কেহবা লোকটার অক্ষমতা ও বিপত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে।

'এমন অবস্থায় দেশের অতি ক্ষুদ্র কাজটিকেও গড়িয়া তোলা কত কঠিন সে কথা আমরা যেন প্রত্যেকে বিবেচনা করিয়া দেখি। একটা ছোট ইস্কুল, একটা সামান্য লাইব্রেরী, একটা আমোদ করিবার দল বা একটা অতি ছোট রকমেরও কাজ করিবার ব্যবস্থা আমরা জাগাইয়া রাখিতে পারি না। সমুদ্রে জল থই-থই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই; আমাদের দেশের ষষ্ঠীর প্রসাদে মানুষের অভাব নাই, কিন্তু কর্তব্য যখন তাহার পতাকা লইয়া আসিয়া শঙ্খধ্বনি করে তখন চারিদিকে চাহিয়া একটি মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না।'

দু'শ বছর ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় বাস করে বাঙালির যুদ্ধ করার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে বাঙালির মধ্যে যে যুদ্ধংদেহি মনোভাব প্রকাশ পায় সে সম্পর্কে ১৩১৪ সালে 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয় প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন

করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা ছাড়া এক মুহূর্তেই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম 'এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল', তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ, আমরা দেশকে যে যতই ভালোবাসি-না কেন, দেশকে ঠিকমত কেহ কোনোদিন জানি না।'

ওই প্রবন্ধটি বঙ্গবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, 'বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা দিলাম। এই স্পর্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল এক পক্ষ হইতেই চলিবে, অপর পক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

'অপর পক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ কথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি, আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে।

'...ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দে মাতরম হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

'কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে, এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে।

'যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্যথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এত বড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ার-ভাটা রোদবৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া, যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।'

বাঙালির কাজের ধারা সমালোচনা করে ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, 'আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি, কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী রচনা লইয়া আমাদের তর্ক-বিতর্কের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া, বাধা

খাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।'

বাঙালির কাজের অভাব নেই। সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।' সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুধুমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি, এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী সুগভীর। ইহার কোন্ দুঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে, নানা দিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।...

'বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতি পদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব-স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে—আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি, আমরা কত বড়ো ভয়ংকর, সে আলোচনায় কাহারও কোনো লাভ নাই।"

কী কাজ করতে হইবে প্রশ্ন করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উত্তর দিলেন, 'এখন স্পষ্ট করিয়া বলো, কী কাজ করিতে হইবে। আচ্ছা, মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষ লক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা এক সময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী। কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম—কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে অসংযম চরিত্রদুর্বলতার বিলাস মাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে—এ সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।'

১৩৩০ সালে *রাজাপ্রজায়* নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি বলেন, 'ডিপ্লম্যাসি-অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম এই, নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

'কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই, কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা দুয়ো দিবার, বাহবা লইবার এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুশি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল তাহা আমরা ভুলিয়া যাই এবং কটু ভর্ৎসনার পর সঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেন্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্ধা বাড়িয়া উঠে।'

১২ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বাঙালির দলাদলি

চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট চরিত্র শ্রীনবীনকিশোর শর্মণঃ বলছেন, 'তর্কবিতর্কের প্রবৃত্তি দূর করিয়া এক বার ভাবিয়া দেখো দেখি, মহৎ ভাবকে উপন্যাসগত কুহেলিকা জ্ঞান না করিয়া মহৎ ভাবকে সত্য মনে করিয়া, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া, তাহার জন্য আমাদের দেশে কয়জন লোক আত্মসমর্পণ করে। কেবল দলাদলি, কেবল 'আমি আমি আমি' এবং 'অমুক অমুক অমুক' করিয়াই মরিতেছি। আমাকে এবং অমুককে অতিক্রম করিয়াও যে দেশের কোনো কাজ, কোনো মহৎ অনুষ্ঠান বিরাজ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। এই জন্য আপন আপন অভিমান লইয়াই আমরা থাকি। আমাকে বড়ো চৌকি দেয় নাই, অতএব এ সভায় আমি থাকিব না—আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই, অতএব ও কাজে আমি হাত দিতে পারি না—সে সমাজের সেক্রেটারি—অমুক, অতএব সে সমাজে আমার থাকা শোভা পায় না—আমরা কেবল এই ভাবিয়াই মরি। সুপারিশের খাতির এড়াইতে পারি না, চক্ষুলজ্জা অতিক্রম করিতে পারি না, আমার একটা কথা অগ্রাহ্য হইলে সে অপমান সহ্য করিতে পারি না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উদ্দেশ্যে কেহ যদি আমার সাহায্য লইতে আসে, আমি পাঁচ টাকা দিয়া মনে করি তাহাকেই ভিক্ষা দিলাম, তাহাকেই সবিশেষ বাধিত করিলাম—সে এবং তাহার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশসংখ্যক পূর্বপুরুষের নিকট হইতে মনে মনে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়া থাকি। নহিলে মনের তৃপ্তি হয় না।'

১৩০০ সালে *রাজাপ্রজা*-র 'ইংরাজ ও ভারতবাসী'-তে রবীন্দ্রনাথ : 'একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই। আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারো নেতৃত্ব

স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদবুদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদভিন্ন হইয়া উঠে, দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদযোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক, কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন রিপোর্ট ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

'এই দুর্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কী সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

'এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতে ইচ্ছা যায়। একটা কোনো আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে; বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে তাহারা কী মনে করিবে।'

১৩১১ সালে 'স্বদেশী সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহারা যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

'আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

'এই সমাজপতি কখনো ভালো, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে

পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকেই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।'

১৩১৩ সালে *আত্মশক্তি ও সমূহ*-এর 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের দেশে সম্প্রতি যে সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে তাহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনা প্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের এক প্রকার আত্ম বিনোদন।'

১৩১৩ সালে 'সাহিত্য-পরিষৎ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই যে আমাদের দেশে কোনো মতেই কিছুই আট বাঁধে না, সংকল্পের চারি দিকে দল জমিয়া উঠে না, কোনো আকস্মিক কারণে দল বাঁধিলেও সকালের দল বিকাল বেলায় আলগা হইয়া আসে, এইটি ছাড়া আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় কোনো বিপদ নাই। আমাদের এই একটি মাত্র শত্রু। নিজের এই প্রকাণ্ড শূন্যতা আছে বলিয়াই আমরা অন্যকে গালি দিই। আমরা কেবলই কাঁদিয়া বলিতেছি : আমাদিগকে দিতেছে না। বিধাতা আমাদের কানে ধরিয়া বলিতেছেন : তোমরা লইতেছ না। আমরা একত্র হইব না, চেষ্টা করিব না, ত্যাগ করিব না, কষ্ট সহিব না, কেবলই চাহিব এবং পাইব—কোনো জাতির এতবড়ো সর্বনেশে প্রশ্রয়ের দৃষ্টান্ত জগৎসংসারের ইতিহাসে তো আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তবু কেবল আমাদেরই জন্য বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ অপেক্ষায় আকাশে চাহিয়া বসিয়া আছি। সে বিধি আমাদের দেশে কবে চলিবে জানি না, কিন্তু বিনাশ তো সবুর করিবে না। সবুর করেও নাই; অনশন মহামারী অপমান গৃহবিচ্ছেদ চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রদেব বজ্র হাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন; খবরের কাগজে মিথ্যা লিখিতে পারি, সভাস্থলে মিথ্যা বলিতে পারি, রাজার চোখে ধুলা দিতে পারি, এমনকি, নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ; কিন্তু তাঁহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না। যাহার উপরেই দোষারোপ করি না কেন, রাজাই হোক বা আর যেই হোক, মরিতেছি তো আমরাই; মাথা তো আমাদেরই হেঁট হইতেছে এবং পেটের ভাত তো আমাদেরই গেল। পরের কর্তব্যের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া আমাদের শ্মশানের চিতা তো নিভিল না।'

১৩৪১ সালে 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। পরস্পর বিরুদ্ধে ঘোঁট করতে, চক্রান্ত করতে, জাত মারতে তার স্বাভাবিক আনন্দ—আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি সেই 'আনন্দক্ষোভ'। মানুষের সব চেয়ে নিকটতম যে-সম্বন্ধবন্ধন বিবাহ ব্যাপারে, গোড়াতেই সেই বন্ধনকে অহেতুক অপমানে জর্জরিত করবার বরযাত্রিক মনোবৃত্তিই তো বাংলাদেশের

সনাতন বিশেষত্ব। তার পর কবির লড়াইয়ের প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত অশ্রাব্য গালিবর্ষণকে যারা উপভোগ করবার জন্যে একদা ভিড় করে সমবেত হত, কোনো পক্ষের প্রতি বিশেষ শত্রুতাবশতই যে তাদের সেই দুয়ো দেবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস তা তো নয়, নিন্দার মাদক রসভোগের নৈর্ব্যক্তিক প্রবৃত্তিই এর মূলে। আজ বর্তমান সাহিত্যেও বাঙালির ভাঙন ধরানো মনের কুৎসামুখরিত নিষ্ঠুর পীড়ননৈপুণ্য সর্বদাই উদ্যত। সেটা আমাদের ক্রুর অট্টহাস্যোদ্দীপক গ্রাম্য অসৌজন্যসম্ভোগের সামগ্রী। আজ তো দেখতে পাই বাংলাদেশের ছোটো বড়ো খ্যাত অখ্যাত গুপ্ত প্রকাশ্য নানা কণ্ঠের তূণ থেকে শব্দভেদী রক্তপিপাসু বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। এই অদ্ভুত আত্মলাঘবকারী মহোৎসাহে বাঙালি আপন সাহিত্যকে খান খান করে ফেলতে পারত, পরস্পরকে তারস্বরে দুয়ো দিতে দিতে সাহিত্যের মহাশ্মশানে ভূতের কীর্তন করতে তার দেরি লাগত না—কিন্তু সাহিত্য যেহেতু কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়, যেহেতু সে নির্জনচর একলা মানুষের, সেইজন্যে সকলপ্রকার আঘাত এড়িয়েও বেঁচে গেছে। এই একটা জিনিস ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয় নি। এই সাহিত্যরচনায় বাঙালি নিজের একমাত্র কীর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে বলেই এই নিয়ে তার এত আনন্দ। আপন সৃষ্টির মধ্যে বৃহৎ ঐক্যক্ষেত্রে বাঙালি আজ এসেছে গৌরব করবার জন্যে। বিচ্ছিন্ন যারা তারা মিলিত হয়েছে, দূর যারা তারা পরস্পরের নৈকট্যে স্বদেশের নৈকট্য অনুভব করছে।"

১৩৪৭ সালে 'সাহিত্য বিচার'-এ প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি, তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালি পাঠক অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি। মুশকিল এই যে, বাঙালি কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না।'

২০ মে ১৯৩৯ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রে ভারতবর্ষে কংগ্রেসের মধ্যকার দলাদলি উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভরসার কথা বলেন, 'সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে, সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাইনে—আমার দেখার শক্তি নেই। আজকের এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড় করব সেই বাংলাকেই বড় করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ।...বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়।'

রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ করে হবে সুভাষচন্দ্র বসুর তপস্যায়। তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। ভারততীর্থের প্রতি অবিচল বিশ্বাস নিয়ে ভারতীয় বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাংলা কংগ্রেস ও এডহক কংগ্রেস সুভাষপন্থী ও খাদীপন্থীদের মধ্যকার কলহ যখন তীব্র হয়ে উঠে তখন *শনিবারের চিঠির* সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে স্বদেশী যুগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর মাস তিনেক আগে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মত আমরা আবদারে ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনটা হ'ল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়। নিজেরা করব না, কাউকেও কিছু করতে দেব না।

'একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলাদেশে, যে-সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাঁধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্য দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংষ্টা বের করে আছে।...

'ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলাদেশ। অথচ বাঙালির আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে,—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালির ভালো আজ আর কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না।...

এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে সেদিন যে সুযোগ বাঙালি পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে ক্বচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোনও কাজে লেগেছে? যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালির এতদিন অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিকস্ সেই নিষ্ফলতাই সাক্ষ্য দিচ্ছে।' [*শনিবারের চিঠি*, বৈশাখ, ১৩৪৭] বাঙালির দলাদলি স্বভাব হ্রাস পায় নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে নির্বাচনে প্রতিযোগিতার কারণে। বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো কিছুই আট বাঁধে না।

১০ অক্টোবর ২০০৩

বাঙালির ভাবপ্রবণতা

১৩০৯ সালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এ রবীন্দ্রনাথ বাঙালির ভাবালুতা সম্পর্কে বলেন, 'ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজে সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

'আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি; কিন্তু পৌরুষ লাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণবসাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। একদিকে দুর্গায় ও আর এক দিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়েছেন। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।'

বঙ্গভঙ্গের সময় যে আন্দোলন হয় সে সম্পর্কে নির্লিপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমি সেদিন দেশকে যে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম সে বিশেষ কিছু নতুন কথা নয় এবং তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাতে স্বদেশহিতৈষীর কানে সেটা

কটু শোনায়। কিন্তু, আর কারও মনে না থাকতে পারে, আমার স্পষ্টই মনে আছে যে আমার এই সকল কথায় দেশের লোক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যারা কটুভাষা ব্যবসায়ী সাহিত্যিক গুণ্ডা আমি তাদের কথা বলছি নে, কিন্তু গণ্যমান্য এবং শিষ্টশান্ত ব্যক্তিরাও আমার সম্বন্ধে ধৈর্য রক্ষা করতে পারেননি। এর দুটি মাত্র কারণ—প্রথম ক্রোধ, দ্বিতীয় লোভ। ক্রোধের তৃপ্তিসাধন হচ্ছে এক রকমের ভোগসুখ; সেদিন এই ভোগসুখের মাতলামিতে আমাদের বাধা অতি অল্পই ছিল—আমরা মনের আনন্দে কাপড় পুড়িয়ে বেড়াচ্ছি, পিকেট করছি, যারা আমাদের পথে চলছিল না তাদের পথে কাঁটা দিচ্ছি এবং ভাষায় আমাদের কোনো আব্রু রাখছি নে। এই সকল অমিতাচারের কিছুকাল পরে একজন জাপানি আমাকে এক দিন বলেছিলেন, 'তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্যসাধনের সদুপায় নয়।' তার জবাবে সেই জাপানিকে আমার বলতে হয়েছিল যে, উদ্দেশ্যসাধনের কথাটাই যখন আমাদের মনে উজ্জ্বল থাকে তখন মানুষ স্বভাবতই আত্মসংযম করে নিজের সকল শক্তিকেই সেই দিকে নিযুক্ত করে। কিন্তু ক্রোধের তৃপ্তিসাধন যখন মত্ততার সপ্তকে সপ্তকে উদ্দেশ্যসাধনকে ছাড়িয়ে উঠতে থাকে তখন শক্তিকে খরচ করে দেউলে হতে আমাদের বাধা থাকে না। যাই হোক, সে দিন ঠিক যে সময়ে বাঙালি কিছু কালের জন্যে ক্রোধতৃপ্তির সুখভাগে বিশেষ বিঘ্ন পাচ্ছিল না, সমস্তই যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো বোধ হচ্ছিল, সেই সময়ে তাকে অন্য পথের কথা বলতে গিয়ে আমি তার ক্রোধের ভাজন হয়েছিলেম। তা ছাড়া আরো একটি কথা ছিল, সে হচ্ছে লোভ। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিস পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে অনেক সস্তায় পাব—হাত জোড় করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সে দিন দেশ মেতেছিল। ইংরেজ দোকানদার যাকে বলে reduced price sale সে দিন যেন ভাগ্যের হাটে বাঙালির কপালে পোলিটিকাল মালের সেই রকম সস্তা দামের মৌসুম পড়েছিল। যার সম্বল কম, সস্তার নাম শোনবা মাত্র সে এত বেশি খুশি হয়ে ওঠে যে, মালটা যে কী আর তার কী অবস্থা তার খোঁজ রাখে না, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে তেড়ে মারতে যায়। মোট কথা, সে দিনও আমাদের লক্ষ্য ছিল ধ্যান ছিল ঐ বাইরের মায়াটা নিয়ে। তাই তখনকার কালের একজন নেতা বলেছিলেন, 'আমার এক হাত ইংরেজ সরকারের টুঁটিতে, আর এক হাত তার পায়ে।' অর্থাৎ কোনো হাতই বাকি ছিল না দেশের জন্য। তৎকালে এবং তার পরবর্তীকালে এই দ্বিধা হয়তো অনেকের একেবারে ঘুচে গেছে, এক দলের দুই হাতই হয়তো উঠেছে সরকারের টুঁটিতে, আর এক দলের দুই হাতই হয়তো নেমেছে সরকারের পায়ে, কিন্তু মায়া থেকে মুক্তিসাধনের পক্ষে দুইই হচ্ছে

বাইরের পথ। হয় ইংরেজ সরকারের দক্ষিণে নয় ইংরেজ সরকারের বামে পোড়া মন ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার হাঁ'ই বল আর না'ই বল দুইই হচ্ছে ইংরেজকে নিয়ে।

'সেদিন চারি দিক থেকে বাংলাদেশের হৃদয়াবেগের উপরেই কেবল তাগিদ এসেছে। কিন্তু শুধু হৃদয়াবেগ আগুনের মতো জ্বালানি বস্তুকে বরঞ্চ করে, ছাই করে ফেলে—সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের সেই অন্তঃকরণকে সে দিন জাগানো হলো না, সেইজন্য এত বড় একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারল না।

'এমনটা যে হল তার কারণ বাইরে নেই, তার কারণ আছে আমাদের নিজেরই ভিতরে। অনেক দিন থেকেই আমাদের ধর্মে কর্মে এক দিকে আছে হৃদয়াবেগ, আর এক দিকে আছে অভ্যস্ত আচার। আমাদের অন্তঃকরণ অনেক দিন থেকে কোনো কাজ করেনি; তাকে ভয়ে ভয়ে চেপে রাখা হয়েছে। এইজন্যে যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার দরকার পড়ে তখন তাড়াতাড়ি হৃদয়াবেগের উপর বরাত দিতে হয় এবং নানারকম জাদুমন্ত্র আউড়িয়ে মনকে মুগ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটে। অর্থাৎ সমস্ত দেশ জুড়ে এমন একটা অবস্থা উৎপাদন করা হয় যেটা অন্তঃকরণের কাজ করার পক্ষে বিষম প্রতিকূল।

'অন্তঃকরণের জড়তায় যে ক্ষতি সে ক্ষতিকে কোনো কিছুতেই পূরণ করা যায় না। কোনোমতে যখন পূরণ করতে চাই তখন মোহকে সহায় করতে ইচ্ছা হয়, তখন অক্ষমের লোভ আলাদিনের প্রদীপের গুজব শুনলেই একেবারে লাফিয়ে ওঠে। এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, আলাদিনের প্রদীপের মতো এমন আশ্চর্য সুবিধার জিনিস আর নেই, কেবল ওর একটি মাত্র অসুবিধা এই যে ও জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু পাওয়া যে যায় না, এ কথা খুব জোরের সঙ্গে সে মানুষ কিছুতেই বলতে পারে না যার লোভ বেশি অথচ যার সামর্থ্য কম। এইজন্যে তার উদ্যম তখনি পুরোদমে জেগে ওঠে যখন তাকে কেউ আলাদিনের প্রদীপের আশ্বাস দিয়ে থাকে সেই আশ্বাসকে হরণ করতে গেলে সে এমনি চিৎকার করতে থাকে যেন তার সর্বস্বান্ত করা হল।'

১৩ জুলাই ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ভাব পুনর্ব্যক্ত করেন, 'বাঙালি স্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাস ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালি প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে একজন জাপানি আমাকে বলেছিল, রাষ্ট্রবিপ্লবের আর্ট তোমাদের নয়, ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ করে তুলেছ, সিদ্ধি লাভের জন্য যে তেজকে যে সংকল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয় গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত

বিক্ষিপ্ত করে দাও। এই জাপানির কথা ভাববার যোগ্য। সৃষ্টির কার্য যে কোন শ্রেণীর হোক তার শক্তির উৎস নিভৃতে গভীরে, তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে ভাবসংযমের দরকার। যে উপাদানে উচ্চ অঙ্গের মূর্তি গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রতিরোধের কঠোরতা থাকা চাই, ভেঙে ভেঙে কেটে কেটে তার সাধনা। জল দিয়ে গলিয়ে যে মৃৎপিণ্ডকে শিল্প রূপ দেওয়া যায় তার আয়ু কম, তার কণ্ঠ ক্ষীণ। তাতে যে পুতুল গড়া যায় সে নিধুবাবুর টপ্পার মতই ভঙ্গুর।'

৫ ফাল্গুন ১৩৪৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্‌যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব কিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত করে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধি-বিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ করে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন বলে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ার সঞ্জয়।

'আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহু শতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্তি।'

২১ মার্চ ১৯৩৮ শ্রী দিলীপ কুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসূ কল্পনার বীজ, তাই বাঙালীর রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা। এই জেনারেশ্যানের কাছ থেকে হয়তো খুব বেশি কিছু পাওয়া যাবে না, কিন্তু পরবর্তী কালকে দাবিয়ে রাখবে কে? এটা আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতির চর্চাতেই কী করে দেশ উদ্ধার পেতে পারে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান,

নাচ, গান এদের কি কিছু দাম নেই। আনন্দকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখে এমন কি চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে বুঝি নে। দেশের অস্থিমজ্জায় আনন্দকে চারিয়ে তোলো, তাতে সব দিক থেকেই লাভ হবে। এমন কি রাজনীতির দিক থেকেও।'

১৩৪১ সালে কলকাতা সিনেট হাউসে অল-বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের উদ্বোধন-বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, '...বাংলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে, বাঙালি ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে উদ্বৃত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় বর্বরের দিকে। পরিমিতভাবে যখন ফলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের শক্তি পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীব্র ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসকে সে গানে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত করে। দেখুন বৈষ্ণব সংগীত-সমস্ত হিন্দুস্থানী সংগীতকে পিছনে ফেলে—বাঙালির প্রাণ আপনার সংগীতকে উদ্ভাসিত করেছে যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজমাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না করে পারে নি। যে কীর্তন বাঙালি গেয়েছিল তা তৎকালীন পরিপার্শ্বিকের ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। সে তার প্রাণের ধর্ম প্রকাশ করেছে এবং আরও পাবার জন্য দাবি করেছে। এটা আমার কাছে গৌরবের বিষয় বলে মনে হয়। বাইরের স্পর্শে যেই কোনো উদ্দীপনা তাকে জাগিয়ে তুলেছে, অমনি সে সৃষ্টির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সাহিত্য তার প্রমাণ। আজকের দিনের বাঙালি, যে বাঙালি একদিন এই কীর্তনের মধ্যে, লোকসংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে, সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলি পুনরাবৃত্তি করবে।'

২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বাঙালির ভাবভাষার দৈন্য

১৮৯৩ সালে ফেব্রুয়ারিতে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলছেন, 'আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না—কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না, বৃহৎ কার্যের যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে,তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মত বক্ বক্ করে বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ে আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের একটা সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে, ইচ্ছা করে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে। কিন্তু সত্যিকার রক্তমাংসে শক্তমর্থ মানুষ তো নেই-সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে। আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো চারটে আইডিয়া আছে তার মতো সঙ্গীহীন একক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই বোধহয়।'

১৬ মে ১৮৯৩ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্লামেনেন্টে সমস্ত দেহ মনপ্রাণ দিয়ে

খাটতে হবে—শহরের রাস্তা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইটে-বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজনেস চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো—তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশ পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তাহলে হয়তো সেই সমস্ত বড়ো বড়ো ওক গাছ কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারী যৎসামান্য মনে হত। কিন্তু তাই বলে কি সত্যিই এই জলিবোট-শায়ী বিমুগ্ধ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক'?

১২ আগস্ট ১৮৯৪ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারেনি—তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায়নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠেনি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যকবোধ নিতান্তই কম—অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার জো নেই, কেননা বোলচাল সমস্ত ইংরেজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে—সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই।

২৬ অক্টোবর ১৮৯৩ সালে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে বাংলা ভাষার দৈন্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের বেশে ভূষায় বাক্যে এবং চিন্তাতেও অনেকটা বাহুল্য থাকে—গরম দেশে অত্যন্ত নিরেটভাবে মনঃসংযোগ করাটা দুঃখকর। কেননা এখানে কাজের তুলনায় অবকাশটা একটু প্রচুর না হলে আমরা বাঁচিনে। অতএব যখন সময়ের টানাটানি নেই তখন ভাব ও বাক্যসমাবেশের ঠাসাঠাসিটা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। ওতে লেখকেরও সংযমের দরকার করে পাঠকেরও তাই—তাড়া থাক্‌লে সেটা করা যায় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে গয়ংগচ্ছ চালটাই মানুষ স্বভাবত পছন্দ করে। এই সকল কারণেই...গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখি নি। যখন আমাদের পণ্ডিত-মশায়রা কাদম্বরীর রীতিতে বাংলা গদ্য লিখ্‌তেন তখন তাঁরা আর

যাই হোক্ এটা জানতেন যে লেখাটা একটা চাষের ফসল, ওটা আগাছা নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের গদ্যলেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁচে হয়েছে। আমাদের দেশে যে একটা হঠাৎ ডিমক্রাসির প্রাদুর্ভাব হয়েছে এখনো তার চালচলনে পাক ধরেনি—গদ্যসাহিত্যে তার প্রকাশটা অত্যন্ত শস্তাদামের শৈথিল্য-প্রাচুর্য্যের দ্বারাই নিজের পরিচয় দিচ্ছে।'

২ এপ্রিল ১৮৯৫ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে এক পত্রে বাঙালির ভাব ও ভাষার দৈন্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষায় অক্ষমতা নয়—যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেই জন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয়—তার পরে নিজের ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়। আমি বার বার দেখেছি বাঙালিরা একটা কোন ভাবের সূত্র মনে মনে সহজে অনুসরণ করতে পারে না, তারা একদম ফীলিঙে মেতে উঠতে চায়—একটা বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে কত শত জিনিস ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।'

পরে ২৫ নভেম্বর ১৮৯৫ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মনে হয় যদি গেটের মতো শুভাদৃষ্টি আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানব প্রকৃতি বিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব—এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

১৩০১ সালে 'প্রাঞ্জলতা' প্রবন্ধে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দুর্বলতার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের বাংলাভাষায়, কি খবরের কাগজে কি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে, সরলতা এবং অপ্রমত্ততার অভাব দেখা যায়—সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালবাসে; বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে কাহারো প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এখনো আমাদের মধ্যে একটা আদিম বর্বরতা আছে; সত্য প্রাঞ্জল-বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্যতা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহার মর্যাদা নষ্ট হয়।'

১৩০৯ সালে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া

যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এই জন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।'

বাংলা ভাষার 'মঙ্গলকাব্য' সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগ্‌বর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।'

২১ কার্তিক ১৩৩৯ প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সহজ করে সরস করে গৌড়ীয় ভাষায় লেখা দুঃসাধ্য কাজ। কেননা ভাষার অস্পষ্টতাবশত হঠাৎ লোকের মনে হতে পারে এ সমস্তই জানা কথা। নতুন জিনিষকে নতুন বলে উপলব্ধি করানো বাংলা ভাষায় সহজ নয়।'

১৩৩০ সালে উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্যের কাশী সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলাভাষা এক সময়ে গেঁয়োরকমের ছিল। তার সহযোগে তত্ত্বকথা ও গভীর ভাব প্রকাশ করবার অনেক বাধা ছিল। তাই বাঙালিকে সেদিন সকলে গ্রাম্য বলে জেনেছিল। তাই যাঁরা সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বিশ্বসত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গভাষায় একান্ত-আবদ্ধ চিত্তের সম্মান করতে পারেননি। বাংলার পাঁচালি সাহিত্য ও পয়ারের কথা তাঁদের কাছে নগণ্য ছিল। অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে, মনে করে, স্বভাবতই সে জ্যোতিহীন। কিন্তু, এ কথাটা তো গভীরভাবে সত্য নয়; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ্য পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না। উপযুক্ত আধারটি না পেলে প্রদীপ আপনার শিখা সম্বন্ধে আপনি অন্ধ থাকে।'

১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শিক্ষার বিকিরণ'-এ তিনি বলেন, 'গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বট গাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে তার কর্মশক্তি অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই সমস্তের উৎকর্ষ।'

'আমাদের সাহিত্য রসেরই প্রাধান্য। সেই জন্যে যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে উঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে।'

১৯৩৮ সালে *বাংলাভাষা-পরিচয়*-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'খাঁটি বাংলা ছিল আদিমকালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ষোলো-আনা চলা অসম্ভব।' তাঁর কথা, 'আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র যতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চলতিভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল।'

প্রায় ১৫ বছর আগে ১৩৩০ সালে উত্তর ভারতের বঙ্গসাহিত্যের কাশী সম্মেলনে বলেছিলেন, 'যেহেতু মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন হচ্ছে তার ভাষা তাই তার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ ভাষার দৈন্য দূর করে আপনার যথার্থ পরিচয় লাভ করা এবং সেই পূর্ণ পরিচয়টি বিশ্বের সমক্ষে উদঘাটিত করা।'

বাংলা ভাষার দৈন্যমোচন ও সংস্কারের প্রশ্নে দেশের ভাষার অধিকারীদের মধ্যে শুধু মতদ্বৈধ নয়, মনোমালিন্যও রয়েছে। বাংলা ভাষার সাধু, চলতি, আদালতি, মুসলমানি, হিঁদুয়ানি, বিদেশী ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার গ্রহণ-বর্জন ইত্যাদি মুতফরাক্কা বিষয়ে কচ্চালের শেষ নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় আট দশক ধরে বানান সংস্কারের জন্য বিবিধ সুপারিশ করা হয়েছে। ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ছাড়াও বাংলা ভাষার অন্যান্য পণ্ডিত এই ব্যাপারে নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলার বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের ইস্টবেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ কমিটি, বাংলা একাডেমীর বানান সংস্কার কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পর্ষদের কমিটি, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করে। বানান সংস্কারের ব্যাপারে বিভিন্ন সুপারিশ সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে 'ও', 'এ' এবং 'অ্যা' স্বরের জন্য বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলা একাডেমী, বিশ্বভারতী ও

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। তবে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানানে যেসব বিকল্প সুপারিশ করা হয়েছে তা ছাড়াও অন্যান্য নানা ব্যাপারে মতদ্বৈধ রয়েছে। যেমন ইচ্ছা লেখো-র ভাবটা রয়ে গেছে। প্রথম সারির বাংলা দৈনিকগুলোর ভাষার মধ্যে যে তারতম্য লক্ষ করা যায় তা বর্তমানে অন্য কোনো ভাষায় পরিলক্ষিত হয় না। ব্রিটিশ ও মার্কিন ইংরেজির বানানের মধ্যকার পার্থক্য তেমন বিসদৃশ নয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ভাষার রীতি বা বানান, উভয় সম্পর্কে জাতীয় সংসদের হস্তক্ষেপ ছাড়া সমস্যার সমাধান হবে না। জাতীয় সংসদ স্বয়ং আইন প্রণয়ন করে অথবা কোনো ভাষা কমিটি বা কমিশনের সুপারিশকে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় করার জন্য যথাযথ বিধান দিতে পারে। এ ব্যাপারে আইনের বাধ্যবাধকতা চূড়ান্তভাবে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা আশাপ্রদ না হলেও দেশে ভাষার জগতে বিরাজমান অরাজকতা কিছুটা দূর হলেও হতে পারে।

বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার গতি বড়োই শ্লথ। কম্পিউটারের বাংলা কিবোর্ড প্রমিতকরণের বিষয়টি শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। বাংলাদেশ প্রকৌশল (বুয়েট) বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. মোহাম্মদ শাহজাহানকে সভাপতি করে যে প্রমিত কিবোর্ড প্রণয়ন শুরু হয়, সর্বসম্মতিক্রমে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বিষয়টি এখনো অমীমাংসিত রয়েছে।

৩০ মে ২০০৩

বাঙালির পর্যবেক্ষণশক্তি ও অনুৎসুক্য

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে বলছেন, 'তার পরে আবার আমরা বাঙালিরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে 'স্বাধীন' চিন্তাশীল। স্বাধীন চিন্তার অর্থ এই যে চিন্তার কোনো অবলম্বন নেই; যার জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের কোনো আবশ্যক করে না। আর সকল প্রকার অপবাদই আমাদের সহ্য হয়, কিন্তু চিন্তা সম্বন্ধে কারও সাহায্য গ্রহণ করেছি এ অপবাদ অসহ্য। স্ত্রীলোকদের ন্যায় আমাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। প্রচলিত বিজ্ঞানশাস্ত্রের সঙ্গে যতই অনৈক্য হবে আমাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও ততই স্বাধীনচিন্তাসম্পন্ন বলে সমাদৃত হবে; এবং যতই আমরা অধিক চক্ষু মুদ্রিত করতে পারব, দর্শনশাস্ত্র ততই আমাদের সমধিক পারদর্শিতা লাভ করবে।'

১২৯৮ সালে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্য। জীবনে ব্যবহারের জন্য নয়। আমাদের বুদ্ধি কুশাংকুরের মত তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই।'

১৩০১ সালে 'সঞ্জীবচন্দ্র'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞবার্ধক্যের লক্ষণ আছে; আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্যের মায়া আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেইজন্য অশনবসন ছন্দভাষা আচারব্যবহার বাসস্থান সর্বত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা।'

১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে বাঙালির হাস্যলেশহীনতার সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'যে দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে সে দেশে বিজ্ঞান

অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া গেছে। সে দেশে বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক জ্ঞান নহে, তাহা মানবমনের সহিত মানব জীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইয়া আছে। এইজন্য সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম হয়, বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হইয়া থাকে। নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চরিত হইয়া সেখানে বিজ্ঞান প্রাণ পাইয়া উঠে। যে দেশে সাহিত্যচর্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের শখের মধ্যে বদ্ধ নহে। তাহা সমাজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত; তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা আকারে মিশ্রিত হইয়াছে এই জন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্বে অতি যৎসামান্যই ছিল।

'কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক বিস্তার-অভাবে অনেকের মধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব এবং আলোচনা অভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারি দিকের মানবমন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।

'আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কী করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকালবেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্বব্যাপী প্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে, যাহাতে আমাদিগকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি গড়াইতেছি এবং যথাকালে, অধিকাংশতই অকালে মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ, আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্যের, আপনার সহিত চতুর্দিকের সর্বাঙ্গীণ মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দিকে সৌন্দর্য রচনা করিবার কোনো ক্ষমতা নাই; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই সকল মনোরুদ্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্য দেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর অতিশয়ো পরিণত হইয়া উঠে।'

১৩০২ সালে 'বিদ্যাসাগরচরিত' ১৩০২-এ তিনি বলেন, 'বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতিসূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না।'

১৯৩৯ সালে 'দেশনায়ক'-এ তিনি বলেন : 'বাঙালি নৈয়ায়িক—বাঙালি অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্রসন্ধানের ভাঙন লাগানো দৃষ্টিতে তার উৎসুক্য। ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র।'

১৩০১ সালে 'অপমানের প্রতিকার'-এ তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের লোকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতি ও দ্বিধা থাকে, এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুনে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষত যখন স্বভাবতই ইংরাজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর 'প্রাণের পবিত্রতা' স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ পরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব, একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শরীর যন্ত্রগুলিরও বিস্তারিত ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।'

ইংল্যান্ডে মানুষ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই লক্ষ্য করে ১৩১৯ সালে 'ইংল্যান্ডের ভাবুকসমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস, মানুষ সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই। মানুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুরশস্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকল রকম ফসল একেবারে অপর্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের

হৃদয়ের সংস্রব সুগভীরও সর্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁহাদের কাছে যেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মানুষের ধন তাঁহারা পুরা পরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরল-বসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না; এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরলে বাস; মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেই জন্য আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্য ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে-ভাইপো-ভাগ্নের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।'

১৩৪৩ সালে 'আশ্রমের শিক্ষা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্ত্রর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জলতোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালো। ওরা নিতান্তই আল্গা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

'নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্ব জগতে।'

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিবৃত্তি চরিত্রগঠনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩২ সালে 'স্বরাজ সাধন'-এ বলছেন, 'চাষি চাষ করা কাজের নিয়ম অভ্যাসের দ্বারা আপনার মনকে ও দেহকে একটা বিশেষ প্রবণতা দিয়েছে। চাষের পথই তার সহজ পথ। যখন সে চাষ করে তখনি সে কাজ করে, যখন চাষ করে না তখন কাজ করে না। কুঁড়ে বলে কাজ করে না, এ অপবাদ তাকে দেওয়া অন্যায়। যদি সম্বৎসর তার চাষ চলতে পারত, তা হলে বছর ভরেই সে কাজ করত।

'চাষ প্রভৃতি হাতের কাজের প্রকৃতিই এই যে, তাতে চালনার অভাবে মনকে নিশ্চেষ্ট করে দেয়। একটা চিরাভ্যস্ত কাজের থেকে আর একটা ভিন্ন প্রকৃতির কাজে যেতে গেলেই মনের সক্রিয়তা চাই। কিন্তু চাষ প্রভৃতি মজুরির কাজ লাইন-বাঁধা কাজ। তা চলে ট্রামগাড়ির মতো। হাজার প্রয়োজন হলেও লাইনের বাইরে নতুন পথ তার পক্ষে সহজ নয়। চাষিকে চাষের বাইরে যে কাজ করতে বলা যায়

তাকে তার মন ডিরেলড় হয়ে যায়। তবু ঠেলেঠুলে তাকে হয়তো নড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে শক্তির অপব্যয় ঘটে।

'বাংলাদেশের অন্তত দুই জেলার চাষির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অভ্যাসের বাঁধন তাদের পক্ষে যে কত কঠিন তার অভিজ্ঞতা আমার আছে। এক জেলা এক ফসলের দেশ। সেখানে ধান উৎপন্ন করতে চাষিরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে। তার পরে তাদের ভিটের জমিতে তারা অবসরকালে সবজি উৎপন্ন করতে পারত। উৎসাহ দিয়েছিলুম, ফল পাই নি। যারা ধান-চাষের জন্যে প্রাণপণ করতে পারে, তারা সবজি-চাষের জন্য একটুও নড়ে বসতে চায় না। ধানের লাইন থেকে সবজির লাইনে তাদের মনকে ঠেলে তোলা কঠিন।

'আর-এক জেলায় চাষি ধান পাট আখ সর্ষে প্রভৃতি সকল-রকম চাষেই লেগে আছে। কিন্তু, যে জমিতে এ-সব শস্য সহজে হয় না সে জমি তাদের বৃথা পড়ে থাকে, তার খাজনা বহন করে চলে। অথচ বৎসরে বৎসরে পশ্চিম-অঞ্চল থেকে চাষি এসে এই জমিতেই তরমুজ খরমুজ কাঁকুড় প্রভৃতি ফলিয়ে যথেষ্ট লাভ করে নিয়ে দেশে ফিরে যায়। তবু স্থানীয় চাষি এই অনভ্যস্ত ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে বিমুখ। তাদের মন সরে না। যে চাষি পাটের ফলন করে তাকে স্বভাবত অলস বলে বদনাম দেওয়া চলে না। শুনেছি পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও কোথাও পাট উৎপন্ন করা কঠিন নয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা পাট প্রস্তুত করার দুঃসাধ্য দুঃখ বহন করতে নারাজ। বাংলাদেশে যে পাট একচেটে তার একমাত্র কারণ এখানকার জমিতে নয়, এখানকার চাষিতে। অথচ আমি দেখেছি, এই চাষিই তার বালুজমিতে তরমুজ ফলিয়ে লাভ করবার দৃষ্টান্ত বৎসর বৎসর সচক্ষে দেখা সত্ত্বেও এই অনভ্যস্ত পথে যেতে চায় না।'

১৩৩৮ সালে 'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত'-এ যন্ত্রের ব্যবহারে বাঙালিদের পশ্চাদ্‌পরতার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'অশিক্ষায় ও অনভ্যাসে আজ বাংলাদেশের মন এবং অঙ্গ যন্ত্র ব্যবহারের মূঢ়।...ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ সর্বপ্রথমে যে ইংরেজী বিদ্যা গ্রহণ করেছে সে হল পুঁথির বিদ্যা। কিন্তু যে ব্যবহারিক বিদ্যায় সংসারে মানুষ জয়ী হয়, য়ুরোপের সেই বিদ্যাই সব-শেষে বাংলাদেশে এসে পৌঁছল। আমরা য়ুরোপের বৃহস্পতি গুরুর কাছ থেকে প্রথম হাতেখড়ি নিয়েছি, কিন্তু য়ুরোপের শুক্রাচার্য জানেন কী করে মার বাঁচানো যায়—সেই বিদ্যার জোরেই দৈত্যেরা স্বর্গ দখল করে নিয়েছিল। শুক্রাচার্যের কাছে পাঠ নিতে আমরা অবজ্ঞা করেছি—সে হল হাতিয়ার-বিদ্যার পাঠ। এই জন্যে পদে পদে হেরেছি, আমাদের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল। বৃহস্পতি গুরুর কাছে যে বিদ্যা লাভ করেছি—তাকে পূর্ণতা দিতে হবে শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা নিয়ে যন্ত্রকে নিন্দা করে যদি নির্বাসনে পাঠাতে হয়, তা হলে যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সেই নিন্দা রটাই তাকে শুদ্ধ বিসর্জন দিয়ে হাতে বোনা ধুতির চলন করতে হবে। বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই বাঙালি ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, এ আত্মরক্ষা।'

যন্ত্রশক্তি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বজাতির পশ্চাদপরতা সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে ২০ মে ১৯৩৯ এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাহির থেকে একটা কথা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই শক্তির কোনটাই সহজসাধ্য নয়, অনেক অনেক তার দাম, সুদীর্ঘ তার প্রয়োগ শিক্ষাচর্চা। বহুকাল ধরে আমরা পরের অধীনে আছি, যন্ত্রশক্তির আঘাত কী রকম তা জানি কিন্তু তার আয়ত্তের উপায় আমাদের স্বপ্নের অগোচর। অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজও এই গরিব জাতের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। ইতিহাসে দেখা গেছে, প্রবলের সঙ্গে অসমকক্ষের মিতালী খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তাতে কুমীরের পেটে ভরে অবিবেচক খাল কাটিয়ের খরচায়। তা ছাড়া অমঙ্গল প্রতিরোধের যোগ্য জনমনঃশক্তি বহুকালের অব্যবহারে গিয়েছে মরচে পড়ে। ভরসা হারিয়েছি। কোনো একটা নেশার ঝোঁকে মরিয়া হয়ে যদি ভরসা বাঁধি বুকে, তবে সে গিয়ে দাঁড়াবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়। এক দিন ছিল যখন সাহস ও বাহুবলের যোগে চলত লড়াই। এখন এসেছে সায়ন্স, শিক্ষিত বুদ্ধির পরে ভর করে। শুধু বুদ্ধি নয় তার প্রধান সহায় প্রভূত অর্থবল। অথচ আমাদের লড়তে হবে শূন্যে তহবিল এবং এমন জনসংঘ নিয়ে যাদের মন কর্মবিধানে দৃঢ় নয়, যারা অশাসিত। যাদের শক্তি হয় অচেতন হয়ে থাকে নয় অন্ধ হয়ে ছোটে। দেশের পলিটিক্সের আরম্ভ হয়েছে এই দুরূহ সমস্যা নিয়ে। সেই জন্যে প্রথম যুগের নেতারা অগত্যা নৌকা বানিয়েছিলেন দরখাস্তের পার্চমেন্ট দিয়ে।'

০৫ ডিসেম্বর ২০০৩

বাঙালির আত্মাভিমান ও আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার

১২৯৪ সালে 'আলস্য ও সাহিত্য'-এ বাঙালির আত্মাভিমান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'দেখো আমাদের সমাজে কার্য নাই, আমাদের সমাজে কল্পনাও নাই, আমাদের সমাজে অনুভাবশক্তিও তেমন প্রবল নহে। অথচ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বাঙালিদের অনুভাবশক্তি ও কল্পনাশক্তি সবিশেষ তীব্র। বাঙালিরা যে কাজের লোক এ কথা এ পর্যন্ত সাহস করিয়া কেহই বলিতে পারে নাই। কিন্তু বাঙালিরা যে অত্যন্ত কাল্পনিক ও সহৃদয় এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর অপবাদের ভাগী হইতে হয়।

'কাজ যাহারা করে না তাহারা যে কল্পনা করে ও অনুভব করে এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়! সুস্থ কল্পনা ও সরল অনুভাবের গতিই কাজের দিকে, আশমান ও আলস্যের দিকে নহে। চিত্রকরের কল্পনা তাহাকে ছবি আঁকিতেই প্রবৃত্ত করে; ছবিতেই সে কল্পনা আপনার পরিণাম লাভ করে। আমাদের মানসিক সমুদয় বৃত্তিই নানা আকারে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বাঙালির মন সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যদি এ কথা স্বীকার করা হয় সহজে বাঙালিকে কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে বাঙালির মনোবৃত্তি সকল দুর্বল।

'কল্পনা যাহাদের প্রবল বিশ্বাস তাহাদের প্রবল, বিশ্বাস যাহাদের প্রবল তাহারা আশ্চর্য বলের সহিত কাজ করে। কিন্তু বাঙালি জাতির ন্যায় বিশ্বাসহীন জাতি নাই। ভূতপ্রেত, হাঁচি-টিকটিকি, আধ্যাত্মিক জাতিভেদ ও বিজ্ঞান বহির্ভূত অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সকলের প্রতি এক প্রকার জীবনহীন জড় বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্বের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই। আফিস-যানের চক্রচিহ্নিত পথ ছাড়িলে বৃহৎ জগতে আর কোথাও যে কোনো গন্তব্য পাওয়া যাইবে ইহা কিছুতেই মনে লয় না। বড়ো ভাব ও বড়ো কাজকে যাহারা নীহার ও মরীচিকা বলিয়া মনে

করে তাহাদের কল্পনা যে সবিশেষ সজীব তাহার প্রমাণ কী? স্পেনদেশ কলম্বসকে বিশ্বাস করিতে বহু বিলম্ব করিয়াছিল কিন্তু যদি কোনো সুযোগে বিধির কোনো বিপাকে বঙ্গদেশে কোনো কলম্বস জন্মগ্রহণ করিত তবে দালান ও সাওয়ার আর দলপতি এবং আফিসের হেড কেরানিগণ কী কাণ্ডটাই করিত। দুইচারিজন অনুগ্রহপূর্বক সরলভাবে তাহাকে পাগল ঠাহরাইত এবং অবশিষ্ট সুচতুরবর্গ যাহারা কিছুতেই ঠকে না এবং যাহাদের যুক্তিশক্তি অতিশয় প্রখর অর্থাৎ যাহারা সর্বদা সজাগ এবং কথায় কথায় চোখ টিপিয়া থাকে তাহারা বক্রবুদ্ধিতে দুই চারি প্যাঁচ লাগাইয়া আমাদের কৃষ্ণকায় কলম্বসের সহস্র সংকীর্ণ নিগূঢ় মতলব আবিষ্কার করিত এবং আপন আফিস ও দরদালানের স্থান সংকীর্ণতা হেতুই অতিশয় আরাম অনুভব করিত।

'বাঙালিরা কাজের লোক নহে, কিন্তু বিষয়ী লোক। অর্থাৎ তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে, 'কাজ কী বাপু!' ভরসা করিয়া তাহারা বুদ্ধিকে ছাড়া দিতে পারে না সমস্তই কোলের কাছে জমা করিয়া রাখে এবং যত সব ক্ষুদ্র কাজে সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিকে অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বড়ো কাজ মহৎ লক্ষ্য সুদূর সাধনাকে ইহারা সর্বদা উপহাস অবিশ্বাস ও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার ফল হয় এই, জগতের বৃহত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া ভুল হয়। নিরুদ্যম কল্পনা অধিকতর নিরুদ্যম হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহার আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অভিমানস্ফীত হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ কল্পনা, রুগ্‌ণ ও রোগের আকার হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

'ইহার প্রমাণস্বরূপে দেখো, আমরা আজকাল আপনাকে কতই বড়ো মনে করিতেছি। চতুর্দিকে অষ্টাদশ সংহিতা এবং বিংশতি পুরাণ গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকার ও অহংকার সঞ্চয় করিতেছি। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্বজাতিকে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচর্ম অসভ্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া, আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের দাসবর্গের হীনবুদ্ধি ক্ষীণকায় দীনপ্রাণ অজ্ঞান অধীনতায় অভিভূত সন্ততি ও পোষ্যসন্ততিগণ আপনাকে পবিত্র আর্য ও সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি এবং প্রভাতের ক্ষীতপুচ্ছ ঊর্ধ্বগ্রীব কুক্কুটের ন্যায় সমস্ত জাগ্রত জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার তারস্বর উত্থাপন করিতেছি! পশ্চিমের বৃহৎ সাহিত্য ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে এক অত্যুন্নত, তেজস্বী, নিয়তগতিশীল, জীবন্ত মানবসমাজের বিদ্যুৎপ্রাণিত স্পর্শ লাভ করিয়া তাহাদের মহত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং বিবিধভঙ্গিসহকারে ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সানুনাসিক স্বরে তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অসুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি। ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞতার অন্ধ অভিমান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহা আমাদের কল্পনার জড়ত্ব প্রমাণ করিতেছে।"

ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন, 'বাঙ্গালা দেশে এক দল লোক কোনো কাজ করে না, আর এক দল লোক খুচরা কাজে নিযুক্ত। এখানে মহৎ উদ্দেশ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে উন্নত সাহিত্যের চির আকরভূমি গভীর আনন্দ নাই। আমরা চিরদিনের সেই তত্ত্বজ্ঞানী জাতি। তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া আবার সৌন্দর্য ভুলিলাম। প্রেমের পরিবর্তে অহংকার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। এখন বলিতেছি, আমরা মস্ত লোক, কারণ আমরা কুলীন, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহই নাই! পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা! মনু অভ্রান্ত! কথাগুলা আওড়াইতেছি, অথচ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কুটিল ব্যাখ্যা দ্বারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছি। যাহা আছে তাহাই ভালো, মিথ্যা তর্কের দ্বারা এইরূপ মন ভুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। জীবন্ত জগতের মধ্যে কোথাও যথার্থ মহত্ত্ব নাই, আছে কেবল এক মৃত জাতির অঙ্গবিকারের মধ্যে, এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিয়া আমরা আরামে মৃত্যুকে আলিঙ্গনপূর্বক পরম নিশ্চেষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বগর্বসুখ ভোগ করিতে থাকি।

'এই জড়ত্ব অবিশ্বাস ও অহংকার চিরদিন থাকিবে না। দীপ আপন নির্বাপিত শিখার স্মৃতিমাত্র লইয়া কেবল অহর্নিশি দুর্গন্ধ ধূম বিস্তার করিয়াই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আলোক তাহার নিজেরই আলোক হইবে।'

অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের যে আত্মাভিমান জেগে ওঠে সে সম্পর্কে ১৩১৪ সালে 'ব্যাধি ও প্রতিকার'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এ কথা নিশ্চয়ই জানি, অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি-উদ্‌বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

'কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ নিষ্ফলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব

সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অঙ্কুরকে বারবার করিয়া ফেলে। যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কী। ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি, এ যে মগের মুল্লুক হইল! মর্লির মুখে লিবারেল নীতির উল্টা কথা শুনিলেই আমরা বলি, এ কি পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠিল!

'আমার নিবেদন এই, এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।'

ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন, 'বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতি পদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব—স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইব।'

১২৯৮ সালে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'-এ দেশীয়দের আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কারকে বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা গৃহকোণে বসে রুদ্র আর্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিশ গণ্ডা দুই পাইকে একঘরে করে কল্পনা করি পৃথিবীর মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক; পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানি নে; এবং যদি থাকে তো কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে আছে তাও বলতে পারি নে; আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখি নে, সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে রেখে দিই কোথাও-না কোথাও আছে, নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক, আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক, বর্তমানের মধ্যেই হোক আর অতীতের মধ্যেই হোক, অর্থাৎ আছেই হোক আর ছিলই হোক, ও একই কথা।

'ধনীর ছেলে যেমন মনে করে আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোনো আবশ্যক নেই, এমন-কি, চাকরি-পিপাসুদের মতো কলেজে পাস দেওয়া আমার

বংশমর্যাদার হানিজনক তেমনি আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে বিশেষ বড়ো, অতএব আমাদের আর-কিছু না করলেও চলে এমন-কি, কিছু না করাই কর্তব্য।

'এ দিকে হয়তো আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয়তো তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই কেবল এই কীটদষ্ট চেকবইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র অপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ঐ বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড়ো বড়ো অঙ্কপাতপূর্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরি করে সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

'অতএব আপাতত আমাদের কোনো বিশেষ মহত্ত্বে কাজ নেই। আমরা যে-ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর করে আমরা যদি পুরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা কুর্তি পরে চতুর্দিকে লড়াই করে করে বেড়াই কিংবা আধ্যাত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিংবা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে রেখে দিই সে পরের কথা।'

ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জন্য একটি সুস্থ আদর্শের কথা তুলে ধরলেন, 'আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদার স্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থ সামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

'অনেকের কাছে এ আইডিয়ালটা আশানুরূপ উচ্চ না মনে হতেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সংগত বোধ হয়। এমন কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মন্যুমেন্ট কিংবা পিরামিড আইডিয়াল নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।'

শান্তিনিকেতন-এর 'কর্মযোগ'-এ পশ্চিম মহাদেশীয়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখেছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে—তাকে সে ভালো করে বিশ্বাসই করে না।

'...এমনি করে কেবলমাত্র করে-যাওয়া চলে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে

বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

'আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপার নিত্য-পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়; আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থানু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়।'

১২৯৯ সালে 'বাংলা-লেখক'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিম্বা কঠিন কর্তব্য পালন তাহার নাম নেই কেবল 'আহা উহু', কেবল কোলে কোলে নাচানো। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দিকে ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, কাঁদিয়া, মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থকপাত করিয়া দেয়; অমনি তাহার মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যানী মহা হাঁক-ডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে; এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার নাসাচক্ষু মুঞ্চন করিয়া তাহারা চিরন্তন আদুরে নামগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ে সান্ত্বনা সাধন করে।

'আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙালির আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্তব্য নহে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিতভাবে প্রিয়বাক্যও বলি—অপ্রিয়বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্যগদগদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসঙ্গত।

'আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভালো জিনিসগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি যে, তাহাতে ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল

কবির সেরা মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে—এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস মনুসংহিতা এবং হিন্দুসমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে জোড়-করে বলিতেন, তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চিৎকার করিয়া বড়ো করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। বাপুরে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্বক একটু সংযতভাবে কথা বলো। পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই ভালোও থাকে, মন্দও থাকে; তোমরা যতই কূটতর্ক করো না সম্পূর্ণ হোহা দ্বারা ঢাকা পড়ে না। যাহার যথেষ্ট ভালো আছে তাহার অল্পস্বল্প মন্দর জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না; সে ভালো মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসংকোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্প অল্প ভালো, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েন্ট ধরিয়া ওকালতি করো। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না। তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশী। কিন্তু ওই কলঙ্কের জন্য বাজে কৈফিয়ত দিতে গেলেই কিম্বা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই, তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।"

চিঠিপত্রে বাঙালি জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'বাস্তবিক, বাঙালি জাতি যে রূপ চালাকি করিতে শিখিয়াছে তাহাতে তাহাদের কাছে কোনো গম্ভীর বিষয় বলিতে বা কোনো শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়। আমরা তো নকল মানুষ। অনেকটা মানুষের মতো। ঠিক মানুষের মতো খাওয়াদাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই—দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই! কিন্ত ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই।

'অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজির উজ্জ্বল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজি ফ্যাশনে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখো, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য, অভিমান, অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাস। দৃঢ়তা নাই, উদ্যম নাই; কারণ সফলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে সিদ্ধি সাধনা ব্যতীত হইয়াছে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়ো না। তাহাকে তোমার বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু সে কখনোই তোমার নহে। আমরা উপার্জন করিতে পারি, কিন্তু লাভ করিতে পারি না। আমরা জগতের সমস্ত জিনিসকে যতক্ষণ না আমার মধ্যে ফেলিয়া আমার করিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ আমরা কিছুই পাই না। ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না।

আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্যকিরণকে আমাদের উপযোগী আলো-আকারে পড়িয়া লয়, তা না হইলে আমরা অন্ধ; আমাদের অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্যকিরণ পড়িলেও কোনো ফল নাই।

'আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোনো বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাস করিব, রোজগার করিব ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা মামলা ও দলাদলিতে আছি। অর্থাৎ হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জতটা আমাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের অপেক্ষা পলায়নেই পিতৃযশ রক্ষা হয় এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ আত্যন্তিক স্নিগ্ধ ভাব ও মজ্জাগত শ্লেষ্মার প্রভাবে নিদ্রাটা আমাদের কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নটাকেই সত্যের আসনে বসাইয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করি।

'যে সকল জাত ঊনবিংশ শতাব্দীর পরে ঊনপঞ্চাশ বায়ু লাগাইয়া চলিয়াছেন, আমরা সাবধানীরা কবে তাঁহাদের নাগাল পাইব? আমাদের যে অল্প একটু বায়ু আছে, সভার নিয়ম রচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়।

'মহৎ আশা, মহৎ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধান বিষয়ী লোকেরা বাষ্পের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাষ্পের বলেই উন্নতির জাহাজ চলিতেছে। ইংরাজেরা য়ুটিলিটেরিয়ান কতকটা দোকানদার; তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে পোয়েটিক্যাল জাস্টিস নামক একটা শব্দ আছে। তাহার অর্থ দেনাপাওনা, সৎকাজের দরদাম করা।

'আজকাল আমাদের এমনি হইয়াছে যে, কেরানিগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই, এমন কি বাণিজ্যকেও পাগলামি জ্ঞান করি! দরখাস্তকে ভবসাগরে তরণী করিয়াছি, নাম সহি করিয়া আপনাকে বীর মনে করিয়া থাকি।

'আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই! মহত্ত্বের একাল আর সেকাল কী? যাহা ভালো তাহাই আমাদের হৃদয় গ্রহণ করুক, যেখানে ভালো সেখানেই আমাদের হৃদয় অগ্রসর হউক! আমাদের লঘুতা চপলতা সংকীর্ণতা দূরে যাক! অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে প্রসূত বাঙালিসুলভ অভিমানে মোটা হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া আপনাকে সকলের চেয়ে বড়ো মনে না করি ও মহৎ হইবার আগে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে মহতের চরণের ধূলি লইতে পারি এমন বিনয় লাভ করি।'

বাঙালির বাস্তবিকতাবিবর্জিত কর্মের সমালোচনা করে ১৩১২ সালে 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই

বল, হৃদয়ই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য ইতিহাসের পুঁথিগত পেট্রিয়টিজম নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই এতকাল গেল, তথাপি এই পেট্রিয়টিজম আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে পেট্রিয়টিজম অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত পেট্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চাল-চিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইয়াছেন। এইরূপ দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এইরূপ পেট্রিয়টিজমের অর্থ বোঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।'

১৩১৫ সালের শ্রাবণে 'সদুপায়'-এ রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জোরজবরদস্তি করার প্রবণতার সমালোচনা করে বলেন, 'অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব, এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না, অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারা আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করতে থাকি।

'যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে, মঙ্গলের দিকে, ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব।'

'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮) প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপন করে আত্মাভিমান প্রসঙ্গ শেষ করা যাক : "স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে

মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্ শিক্ষা, কোন্ চিন্তা, কোন্ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।' এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্যে পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যূষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তা অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?"

১৩৩০ সালে সভাপতির শেষ বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাঙালির প্রধান রিপু হচ্ছে এই আত্মাভিমান, যেজন্য নিরন্তর নিজের প্রশংসাবাদ না শুনতে পেলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাকে অহরহই স্তুতির মদ ঢোঁকে ঢোঁকে গেলাতে হয় তা কমতি হলেই তার অসুখ বোধ হয়। এই চাটুলোলুপ আত্মাভিমান সত্যের অপলাপ বলেই এতে যে মোহান্ধকার সৃষ্টি করে তাতে অন্যকে স্পষ্ট দেখতে দেয় না। এই অন্ধতা দ্বারা আমরা নিজেকে বঞ্চিত করি। আমি জাপানে বাঙালি ছাত্রদের দেখেছি, তারা জাপানে বোতাম তৈরি সাবান তৈরি শিখতে গেছে, কেউ কেউ বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, কিন্তু জাপানকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে দেখবার আগ্রহ তাদের মনের

মধ্যে গভীরভাবে নেই। যদি থাকত তা হলে বোতাম শিক্ষার চেয়ে বড়ো শিক্ষা তাদের হত। তারা জাপানকে শ্রদ্ধা করতে না পারার দ্বারা নিজেদের অশ্রদ্ধেয় করেছে। যে সব বাঙালি উত্তর-পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বা অল্পকাল বাস করছে তারা যদি এই মোহান্ধতার বেষ্টন থেকে নিজদের মুক্ত না করে তা হলে এখানকার মানবসংস্রব থেকে সাহিত্য কিছুই সংগ্রহ করতে পারবে না। যে কয়েদি গরাদের বাইরে রাস্তায় এসে কাজ করে সেও যেমন বন্দী, তেমনি যে বাঙালি আপন ঘর থেকে দূরে সঞ্চরণ করতে আসে তারও মনের পায়ে অভিমান ও অশ্রদ্ধার বেড়ি পরানো।'

২৯ আগস্ট ২০০৩

বাঙালির শিক্ষাদীক্ষা

অতীতে বাঙালির শিক্ষাদীক্ষার একটা নাম ছিল। বাংলাদেশের পণ্ডিতরা উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্থান পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের কায়স্থকরণিকরা বিভিন্ন রাজসভায় কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। সরকারি ও বেসরকারি দলিলপত্র এবং মিশনারিদের প্রতিবেদন থেকে তথ্যাদি আহরণ করে ফ্রিডরিখ ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০) বলেন যে বাংলাদেশে ৮০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষা তখন ছিল ধর্মপ্রথা ও স্মৃতিভিত্তিক। কালক্রমে অর্থানুকূল্যের অভাবে এবং ইংরেজি স্কুলের দাপট ও প্রাধান্যে মক্তব মাদ্রাসা টোল পাঠশালার দারুন দুর্দশা ঘটে। ১৯১০ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫) সরকারি সাহায্যে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কর আরোপের প্রস্তাব করেন। ওই প্রস্তাব গৃহীত হলে নিম্নবর্ণের ও মুসলমানরা উপকৃত হবে এই আশঙ্কায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য নেতৃবৃন্দ ঘোর আপত্তি জানান। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ও বাংলায় প্রায় একশ প্রবন্ধ-ভাষণ-পত্রপ্রবন্ধ ইত্যাদি রচনায় তাঁর সমসাময়িককালের বাঙালির শিক্ষাদীক্ষার সমালোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি কথা বারবার বলেছেন। বাহির হতে চাপিয়ে দেওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজের কোনো যোগ নেই। মুষ্টি বিদ্যার কোনো মৌলিন্য সৃষ্টি হয় নি। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বড় ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে অবিদ্যার অন্ধকার দূর করতে হবে এবং উচ্চশিক্ষা দান করতে হবে।

আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সে সম্পর্কে ১৩২৩ সালে *বাংলা ভাষা পরিচয়ের* পরিশিষ্টে 'ভাষার কথায়' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাঙালী যে ইতিপূর্বে কেবলি চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ কথা

সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্বে তারচেয়ে বড়ো কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এই জন্য ঠিক বাংলা-ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলো বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা-ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।'

ষোলো বৎসর বয়সে ১২৮৪ সালে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই।'

১২৯০ সালে বিদ্যাবিস্তারে মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রথম উচ্চারণ করেন তাঁর 'ন্যাশনাল ফণ্ড' প্রবন্ধে : 'বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।'

১২৯৮ সালে *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে* রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী শিক্ষার কথা বলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যকার বিভেদের কথা বলেছেন : 'আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে ইংরাজি যে জানে এবং ইংরাজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মত দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে।'

১২৯৯ সালে 'শিক্ষার হেরফের'-এ তিনি বলেন, 'আমরা যতই বি.এ, এম.এ, পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধি বৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ব হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না। তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।'

১২৯৯ সালে 'প্রসঙ্গ-কথা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কোনো কোনো ইংরেজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙালি ছাত্রের মধ্যে ওরিজিনালিটির কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে-কথা সত্য।' রবীন্দ্রনাথের মতে, 'তার কারণ দেশী ভাষায় যদি আমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম, তবে সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্যাপ্ত হইত।'

১৯০১ সালে তপোবনের আদর্শে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সেই আশ্রমে হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসরণ করা হতো। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম এবং অন্য বর্ণের অধ্যাপকদের নমস্কার করতে হতো। অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষ কায়স্থ-ব্রাহ্ম ছিলেন। প্রণাম-নমস্কারের সমস্যা সমাধানকল্পে রবীন্দ্রনাথ ওই অধ্যাপককে অধ্যাপনার কাজ হতে নিষ্কৃতি দিয়ে অন্য কাজে নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে কয়েক বছর পরে তাঁর মত বদলান।

পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত স্কুল-পালানো ছেলে যিনি কোনো বিদ্যালয়ে তিষ্ঠাতে পারেন নি এবং অবশেষে নিজেই পরে গুরুদেব হয়ে ইস্কুল খুলেছিলেন। তিনি ১৩১৩ সালে 'শিক্ষাসমস্যা'য় ইস্কুলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।'

তাঁর কথায় : 'বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই—যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে, তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।'

১৩১৪ সালে *আত্মশক্তি* ও সমূহের 'ব্যাধি ও প্রতিকারে' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহু কোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী যতটুকু কাজ

করিয়াছিল আমাদের মাঝখানে এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই।'

১৩১৯ সালে *পথের সঞ্চয়ের* 'শিক্ষাবিধি'তে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল ও রাজকীয় বিদ্যালয়ের নতুন শিকল দুই-ই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সেই পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না।'

বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীর মুক্ত করার কথা বলে তিনি বললেন, 'স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না—তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।'

ওই গ্রন্থের 'লক্ষ ও শিক্ষা'য় তিনি বললেন : 'রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।'

ওই প্রবন্ধে তিনি আরও বললেন, 'আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থ কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই, সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি। মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।'

তাঁর কথা : 'মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই।'

১৩২২ সালের কার্তিকে হিতসাধনমণ্ডলীর সভায় কথিত 'পল্লীর উন্নতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়শিক্ষা। আমরা নোট নিয়েছি, মুখস্থ করেছি, পাস করেছি। বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার মতো আমাদের শিক্ষা মনুষ্যত্বের কুঞ্জে কুঞ্জে নতুন পাতা ধরিয়ে ফুল ফুটিয়ে তুলছে না। আমাদের শিক্ষার মধ্যে কেবল যে বস্তুপরিচয় এবং কর্মসাধনের যোগ নেই তা নয়, এর মধ্যে সংগীত নেই, চিত্র নেই, শিল্প নেই, আত্মপ্রকাশের আনন্দময় উপায়-উপকরণ নেই। এ যে কত বড়ো দৈন্য তার বোধশক্তি পর্যন্ত আমাদের লুপ্ত হয়ে গেছে।...আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই, যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।'

১৩২২ সালে 'শিক্ষার বাহন'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, "শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে 'নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে' তারা কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে একথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি অনিষ্টকর। 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না' একথা যদি সত্যি হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।"

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ সালে *পশ্চিম-যাত্রীর* ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রবাহের তাল মেলে। বদ্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজজ্ঞানের পথে কঠিন বাধা। খাঁচার মধ্যে পাখিকে বাঁধাখোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয়। প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো।...আমি তো পথচলা শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনেকবার প্রস্তাব করেছি, কিন্তু কারও মন পাই নে। কারণ, যারা ভদ্রশিক্ষা পেয়েছে তারা বাঁধনের শিক্ষাকেই বিশ্বাস করতে শিখেছে। আমার ভাগ্য আমাকে শিক্ষায় বিবাগী করেছে বলেই খোলা পথের শিক্ষার ধারাকেই আমি সব চেয়ে সম্মান দিই।'

১৩২৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিনের *শান্তিনিকেতন* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবন সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলে ফেলা হয়।—প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে-বিদ্যা

লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।' তাই শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, 'বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে, চিত্রে, সঙ্গীতে তাদের হৃদয় শতদল পদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে।'

১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি বললেন, 'আজকের দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বজাতির ও সর্বদেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হবে। আমি বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন সেই সংকল্পই আমার মনে কাজ করেছিল।'

১৩২৬ সালে অসন্তোষের কারণে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম।...বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ। অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না।'

ওই বছর আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যার যাচাই'য়ে বললেন, 'ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘকাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা।...সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই।'

১০ মার্চ ১৯২৯ শান্তিনিকেতনের শিক্ষক অনাথনাথ বসুকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বিদ্যালয়ে শিশুকাল হইতে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোনোকালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে রাখালের কাজ কোরো।'

বাঙালির নকল-নৈপুণ্যের কথা বলতে গিয়ে ১৩৩২ সালে 'স্বাতন্ত্র্যসাধনে' রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ফাসিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুপ্ততন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকলনিপুণ মন গুপ্তামিটাকেই সব চেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে।

"আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইশারা চলছে 'মহাজনকে লাগাও বাড়ি', 'জমিদারকে ফেলো পিষে', তখনি বুঝতে পারলুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে বাঙালির অসাধারণ নকলনৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত-পা ছোঁড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।"

ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বললেন, '...আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

'যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।'

১৩২৮ সালে 'শিক্ষার মিলনে' রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ নয় শিক্ষার মিলন ঘটাতে চান। তিনি বললেন, 'পশ্চিমের যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে।' তাঁর মতে একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি আর উল্টো দিকে একঝোঁকা বিজ্ঞানচর্চায় পাশ্চাত্য দেশ মনুষ্যের সার্থকতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এবং সে জন্যে আমাদের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই মতের বিরোধিতা করে, 'শিক্ষার বিরোধ'-এ বলেন বিজেতা ইংরেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো শিক্ষা সার্থক হবে না, ইংরেজরা আমাদের যথার্থ বিজ্ঞান দেবে না এবং আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা ও ত্যাগের মন্ত্র গ্রহণ করবে না।'

১৩১৩ সালে 'শিক্ষা সংস্কার'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেকদিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলুপ খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়।...যে কাঁচা বয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে তখনই সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে মাঠ শস্যশূন্য অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে!

'এই রূপে শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবনা-চিন্তা, আমাদের

লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়, আমরা নকল করি, নজির খুঁড়ি এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি তাহা হয় কোনো-না-কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনোমতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।'

১৩২২ সালে *শিক্ষার বাহন*-এ : 'ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারিদিকের আবহাওয়া থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর স্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। স্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে স্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই স্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোটবইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতেই নেই সাহস। আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?'

১৩৩৭ সালে শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত 'পল্লীসেবা'য় রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষাবিধি বলে একটা পদার্থের আবির্ভাব হয়েছে। তারই নামে স্কুল কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো ইতস্তত মাথা তুলে উঠেছে। এমনভাবে এটা তৈরি যে, এর আলো কলেজি মণ্ডলের বাইরে অতি অল্পই পৌঁছয়—সূর্যের আলো চাঁদের আলোয় পরিণত হয়ে যতটুকু বিকীর্ণ হয় তার চেয়েও কম। বিদেশী ভাষার স্থূল বেড়া তার চারিদিকে। মাতৃভাষার যোগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি সে চিন্তার সাহস অতি অল্প। সে যেন অন্ত পুরিকা বধূর মতোই ভীরু। আঙিনা পর্যন্তই তার অধিকার, তার বাইরে চিবুক পেরিয়ে তার ঘোমটা নেমে পড়ে। মাতৃভাষার আমল প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই অর্থাৎ সে কেবল শিশুশিক্ষারই যোগ্য—অর্থাৎ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শেখবার সুযোগ নেই, সেই বিরাট জনসংখ্যাকে বিদ্যার অধিকার সম্বন্ধে চিরশিশুর মতোই গণ্য করা হয়েছে। তারা কোনোমতেই পুরো মানুষ হয়ে উঠবে না, অথচ স্বরাজ সম্বন্ধে তারা পুরো মানুষের অধিকার লাভ করবে, চোখ বুজে এইটে আমরা কল্পনা করি।

'জ্ঞানলাভের ভাগ নিয়ে দেশের অধিকাংশ জনমণ্ডলী সম্বন্ধে এত বড়ো অনশনের ব্যবস্থা আর কোনো নবজাগ্রত দেশে নেই...দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের এক দেশ নয়।...আমাদের দেশে আমরা পরবাসী—অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ আমাদের নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য অস্পৃশ্য। যখন দেশকে মা বলে আমরা গলা ছেড়ে ডাকি তখন মুখে যাই বলি মনে মনে জানি, সে মা গুটিকয়েক আদুরে ছেলের মা। এই করেই কি আমরা বাঁচব? শুধু ভোট দেবার অধিকার পেয়েই আমাদের চরম পরিত্রাণ?'

'পল্লীসেবা'য় তিন আরো বলেন, 'আমরা স্কুলে কলেজে যেটুকু বিদ্যা পাই সে বিদ্যা ইউরোপীয়। সেই বিদ্যার সাহায্যে য়ুরোপীয়কে বোঝা ও য়ুরোপীয়ের কাছে নিজেকে বোঝানো আমাদের পক্ষে সহজ।...কিন্তু 'যারা মা ষষ্ঠী মনসা ওলাবিবি শীতলা ঘেঁটু রাহু শনি ভূত প্রেত ব্রহ্মদৈত্য গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা পাণ্ডা পুরুতের আওতায় মানুষ হয়েছে তাদের থেকে আমরা খুব বেশি উপরে উঠেছি তা নয়; কিন্তু দূরে সরে গিয়েছি, পরস্পরের মধ্যে ঠিকমতো সাড়া চলে না। তাদের ঠিকমতো পরিচয় নেবার উপযুক্ত কৌতূহল পর্যন্ত আমাদের নেই।'

তাঁর বিভিন্ন রচনায় রবীন্দ্রনাথ মুখস্থবিদ্যার কঠোর সমালোচনা করেন। ১৩২২ সালে 'শিক্ষার বাহনে' তিনি বলেন, 'মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?'

আর এই মুখস্থবিদ্যার সম্পর্কে ১৩৪২ সালে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থবিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়,

নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়।...এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।'

১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। স্যার মাইকেল স্যাডলার ওই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। চারটি কারণে মাতৃভাষার ওপর রবীন্দ্রনাথ জোর দেন। জীবনের গভীরতম বিষয় মানুষ মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজে উপলব্ধি করে। অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে ইংরেজি শেখা প্রায় অসম্ভব। যারা বহু পরিশ্রমে বিদেশী ভাষা শেখে তাদের মধ্যে অনেকে ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে না, তার ফলে তাদের শিক্ষায় ফসল ফলে না এবং মৌলিক বা স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটে না। তারপর নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করলে শিক্ষার ভার মেয়েদের জন্য সহনীয় হবে। এই বক্তব্যগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বারবার উল্লেখ করেছেন।

১৯৩৩ সালে 'শিক্ষার বিকিরণ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা, সুফলা, টানাপাখাশীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা কোনো সভ্য দেশেই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে বঞ্চিত হয়ে নেই।

'এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্যদিকে আধুনিককালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সার্বজনীন দেশের অভিমুখে।...আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা...। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।'

১৮ আগস্ট ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী স্যার আজিজুল হককে এক পত্রে বলেন, 'দেশব্যাপী নিরক্ষরতার ভিত্তির ওপর দেশের কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না এ কথা মনে রেখে সকল দেশই আপন পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেছে।'

৫ ফাল্গুন ১৩৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।...সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলে বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি; জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচবশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি।'

শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্বের সম্পর্কে ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের দেশে আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্ত-বিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন

হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব চেয়ে পর হয়ে—তার সঙ্গে আমাদের দড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বাজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে।...আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি 'এহ বাহ্য'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ...দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ—শিক্ষায় পরধর্ম।

"শিক্ষার প্রভাব সারা সমাজব্যাপী নয় বলে দুঃখ করে তিনি ওই ভাষণে বলেন, 'শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি।...

"যে সমাজের এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল।...

"শিক্ষার ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখলে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলাপ্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত।"

ওই প্রবন্ধে দেশের শিক্ষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকা সৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পর বিচ্ছিন্ন।'

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিস রাথবোন একটা খোলা চিঠিতে অভিযোগ করেন যে, ভারতীয়রা ইংরেজের দৌলতে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে পুরাদস্তুর উন্নতি করলেন, কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপদের সময় তাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না।

ইংরেজিতে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিবাদ ভারতের সব ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন, "আমাদের সে সকল তথাকথিত ইংরেজ-বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতের ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভারতীয়রা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে, দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে। অন্য দিকে রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলে ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালক-বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'স্টেটস্‌ম্যান্স ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।)"

রাজনৈতিক উত্তেজনায় যেন শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে ছিল রবীন্দ্রনাথের সজাগ দৃষ্টি। ৪ নভেম্বর ১৯২০ তিনি এন্‌ড্রুজকে এক পত্রে লিখলেন, '... যখন আমি রাজনীতি করব, তখন আমি শান্তিনিকেতনের কেউ নই।'

৫ ফাল্গুন ১৩৪৩ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশানে ছাত্রদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভাবপ্রবণতা আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্‌যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। ... সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধি-বিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ করে বৃথা শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন-বলে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।'

দেশে বিদ্যাসাধনায় শান্তি ও গাম্ভীর্য নষ্ট হতে দেখে ৫ মে ১৯৩৬ অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'এই কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ডের সূত্রপাত

হয়েছিল যখন আমাদের পোলিটিশানেরা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তরুণের জয়ধ্বনিতে ছাত্রদের বুদ্ধিস্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমন কি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেছিলুম, এবং বুঝেছিলুম এতে করে রাষ্ট্রতপস্যার মূলে লাগিয়ে দেবে দুর্বলতার বিনাশ শক্তি। ছেলেমেয়েদের আবেগ-প্রবণ মনে আত্মশ্লাঘার বেগে তাদের শ্রদ্ধাভক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে গোড়া থেকে শিথিল করে দিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্রের যে হাওয়া দুষিয়ে দেওয়া হয়েছে তার থেকে সহজে নিষ্কৃতি পাব না। ...

'মূল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি করে তোলার একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের শুভগ্রহের সেই সকল ত্যাজ্যপুত্রেরা গোড়া থেকেই ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে। বালোচিত আবদারগ্রস্ত তাদের মনোবৃত্তি, অতি তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা আপোষ করতে নারাজ। এরাই তেরো কাঠা বালুজমির জন্যে তেরো হাজার টাকার মামলা চালায়। যারা স্বভাবত অকর্মণ্য তারা অসহিষ্ণু। এই অসহিষ্ণুতাকে ভয় করি। যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্য ফল পেতে চায়, তারা ভুলে যায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা করে বারে বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুণ্ন ধীর বুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত।'

১৩৪৬ সালের ফাল্গুনে বাঁকুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ছাত্ররা...একথা ভুলে যায় যে, যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিকভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীর্তি গঠিত হচ্ছে না, কীর্তি ভাঙছে। দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে দেশের আশ্রয়সৌধকে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এই সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিপ্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তাঁরা এটা করেছেন স্বাজাত্য কর্তব্যের দোহাই দিয়ে। সভা-ভাঙা পিছনে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। যে-বয়সে কোনো একটা গড়ে তোলবার শক্তি বা অভিজ্ঞতা থাকে না সেই বয়সে তাঁরা নিজের দলের সুযোগ ঘটাবার জন্য এদের কানে ভাঙার মাহাত্ম্য ঘোষণা করে নেশা জমিয়েছেন। দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার কাজে ছেলেদের উৎসাহ জাগিয়েছেন—এই কাজটা সবচেয়ে সহজ।'

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ শান্তিনিকেতনে শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং তার অসফলতার কথা এক প্রাণময় ভাষায় বললেন, 'এখানে আমরা অনেক দিনের অনেক যত্নে কতকগুলি আনন্দের উৎস খুলে দিয়েছি—এখানে আঁকা হচ্ছে ছবি, এখানে গাওয়া হচ্ছে গান, এখানে নানা অভিনয় নিয়ে নানা উৎসব হচ্ছে। এখানে সাহিত্য-আলোচনার

সভা চলছে, এখানে কখনো বা দেশবিদেশের বড়ো বড়ো মনীষীরা আপন আপন অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করছেন, শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান হচ্ছে—এ সকল প্রেরণায় যাঁদের মন সায় দেয় না কিংবা অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ উপেক্ষার সঙ্গে এদের সঙ্গে একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে থাকেন তাঁরা ভালো মাস্টার হতে পারেন এবং হয়তো তাঁরা কর্তব্যনিষ্ঠ, কিন্তু আন্তরিকভাবে তাঁরা এ আশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন।...

'আমি কেবল দুঃখ পাই—প্রত্যহ দেখতে পাই যেখানে এই আশ্রমের প্রাণ সেখানে সেবা পৌঁছায় না। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিই—বুঝতে পারি এতকাল ধরে আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এবং ত্যাগ অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে—আশ্রম হয়েছে ইস্কুল—এই জড়ভার বহন করতে হচ্ছে সহজে নয়, যোগাতে হচ্ছে অনেক বলি। আমারই কর্মভোগ।'

বিশ্বভারতী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বেশ অসন্তোষ ছিল। তাঁর কথায়, তিনি ভাবুকমাত্র এবং বহুকে এক লক্ষ্যে অতিমুখে প্রেরণ করা কেবল ভাবুকের কাজ নয় এবং কাজের যোগ্য বলেই প্রথম দিন থেকেই নিরতিশয় দুঃখ ও বিরুদ্ধতা পেয়েছিলেন। বিদেশী অধ্যাপকদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বাঙালির মধ্যে কোনো আত্মীয়ভাব ও সামাজিকতা গড়ে ওঠে নি। বাংলার বাইরের ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালিরা চিত্তসংকীর্ণতাবশত সহজে মিলতে পারে নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় মিলনের কথা বলেছিলেন বারবার। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একাধিক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর অহঙ্কারের কথাও বলেছেন ২৯ এপ্রিল ১৯৩৪ সালের এক চিঠিতে : 'আজকাল বাংলাদেশ থেকে নাচগান ও ছবির ঢেউ সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে এর প্রথম প্রবর্তনা এইখান থেকেই, সে কথা স্বীকার করতে হবে।'

আজ বাংলাদেশে শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ব্যবধান কিছুটা কমেছে। মাতৃভাষার ব্যবহার বেড়েছে। উচ্চ শিক্ষায় অবশ্য তার চলাচল অত্যন্ত শ্লথ। নারীশিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রীদের সাফল্য তুলনামূলকভাবে ছাত্রদের চেয়ে ভালো। সাধারণভাবে আজ আমরা শিক্ষায় আগের চেয়ে অধিকতর বৈশ্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। শিক্ষায়তনে শুভগ্রহের ত্যাজ্যপুত্র এক ক্ষুদ্র ছাত্রগোষ্ঠীদের আস্ফালন ও দৌরাত্ম্য কদাকার ও হিংস্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশে ক্ষমতা বদলের পর প্রায়শ একটা শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠিত হয়। ড. কুদরাত-এ-খুদা থেকে ড. মনিরুজ্জামান পর্যন্ত সেই রেওয়াজ চলে আসছে। অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষার বিষয়েও আমাদের মতৈক্যের কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম সম্প্রদায় স্বরাজ লাভ করেও সংখ্যালঘিষ্টের রক্ষণশীল প্রবণতা অতিক্রম করতে পারে নি। ১৯৫৯ সালে ড.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, 'পৃথিবীর কোনোও সভ্য দেশে সরকার একাধিক শিক্ষাপ্রণালী কখনও মঞ্জুর করেন না।' আমাদের দেশে এখন তিন ধরনের শিক্ষা চলছে, ধর্মপ্রধান, ইংরেজিপ্রধান ও সাধারণ।

সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা-প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

হজ্জুতে বাহাসকারী হয়তো বলবেন, ওই নীতি একটা সুপারিশ মাত্র এবং আদালতের মাধ্যমে এ বলবৎযোগ্য নয়।

১৯৯০ সালে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের দশ দফায় বলা হয়েছিল, 'শিক্ষাক্ষেত্রে...সারা দেশে অভিন্ন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।' সেই দশ দফার সমঝোতায় দুই প্রধান রাজনীতিক দল স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। কার্যত প্রত্যেক সরকার ওই অঙ্গীকারের কোনো তোয়াক্কা না করে ভোটের কথা ভেবে বলে আসছেন 'মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা হবে।' মাদ্রাসায় শিক্ষা ঐতিহ্যসমৃদ্ধ আমাদের একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার। ইসলামের গৌরবময় যুগে সাধারণ শিক্ষায় পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নি। একই বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের আশ্রয়ে ফিকাহ, হাদিস, গ্রিক ও ভারতীয় দর্শন, অঙ্ক, বীজগণিত ও বিজ্ঞানে মুসলমানরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হতো। তখন বিদেশী প্রভাব প্রতিহত করার কথা ওঠে নি। বরং শিক্ষার জন্য চীনে যাওয়ার নসিহত ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রথম আলোর 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে প্রকাশিত

বাঙালির জীবনে পরাধীনতা

১৩০১ সালে 'রাজা ও প্রজা'য় রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধান চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরান্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে।...

'প্রশ্ন উঠিতে পারে উপদেশ সহজ, কিন্তু উপায়টা কি। তাহার উত্তরে বলিতে হয় কোনো যথার্থ মঙ্গল কলাকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না; তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে, প্রত্যেককে প্রাণপণ করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ভ্রাতা এবং সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়াচরণে অটল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নিজের ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভালো কথার ন্যায় এ কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন এবং অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতন সুদীর্ঘ প্রকাশ্য পথ ছাড়া স্থায়ী কল্যাণের আর কোনো নূতন সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথ আবিষ্কার হয় নাই।'

পরাধীনতার প্রভাবে বাঙালির অবস্থা বিশ্লেষণ করে ১৩১৯ সালে পথের সঞ্চয়-এর 'খেলা ও কাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'শক্তি এই যে-নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে; তখন সে ভয়ে হোক, লোভে হোক বা কেবলমাত্র চিরাভ্যাসের জড়ত্ববশত হোক, নিয়মকে নতজানু হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু যেখানে সে বাধ্য নয়, যেখানে কেবল নিজের

খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, দুর্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুশ্রী ও যদৃচ্ছাকৃত।

'যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে, সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাঁধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, বাঁধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এই জন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো মানি, যেখানে মানি না সেখানে দাসের মতো ফাঁকি দিই। সেইজন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পান্থশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত। যখন সামাজিক বাহ্যশাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই—সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদবোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি, নয় সরকার বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

'কিন্তু এ-সকল বিষয়ে কোনটা যে কার্য এবং কোনটা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। যাহারা বাহিরের নিয়মকে অবাধে শৃঙ্খল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাঁধে; যাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অন্ধভাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্ভাবিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা, এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে, ভিতরের জিনিস, সুতরাং তাহা কাহারও কাছ থেকে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ আমরা মুখে যাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনা হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেইখানেই অন্যের প্রতি অনুশাসন প্রবর্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-লাভের বেলায় ইউরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব, আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই জ্যেষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে—যাহার ভালো করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্বলতাকে আমরা অস্থিমজ্জার

মধ্যে পোষণ করিতে থাকি, অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

'এইজন্যই পরম বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে, কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের একটিমাত্র সমস্যা। যে নিয়ম মানুষের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদিগকে সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্পষ্ট করিয়া জানিতে হইবে যে সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে—কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনই তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনই তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখনই বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে। সেজন্য যেন বাহিরকেই ধিক্কার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।'

প্রায় অনুরূপ কথা রবীন্দ্রনাথ ৪ অক্টোবর ১৯৩০ সালে রাশিয়ার চিঠিতে বলেন : 'যে দেশ পরের কর্তৃত্বে চালিত সেই দেশে সব চেয়ে গুরুতর বাধা হল এই—সে সব জায়গায় দেশের লোকের মনে যে ঈর্ষা যে ক্ষুদ্রতা যে স্বদেশবিরুদ্ধতার কলুষ জন্মায় তার মতো বিষ নেই।'

১৩২৪ সালের ভাদ্রে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লী সমাজে বা ছোটো ছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা, তার শক্তি, তার আশা ভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব; দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকে তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।'

১৩৩৮ সালে 'গান্ধীজী'-তে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাতি দুর্গতি থেকে উদ্ধার

পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনও এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীরভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না। আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা।'

১৩৪০ সালে *কালান্তর*-এ ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে এক দিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা। কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে ভারতের শাসন-কর্তৃত্বে ইংরেজের শরিক হতেও পারি এমন কথা মনে করা যে সম্ভব হয়েছিল, সেই জোর কোথা থেকে পেয়েছিলেম। কোন্ যুগ থেকে সহসা কোন্ যুগান্তরে এসেছি। মানুষের মূল্য, মানুষের শ্রদ্ধেয়তা হঠাৎ এত আশ্চর্য বড়ো হয়ে দেখা দিল কোন্ শিক্ষায়। অথচ আমাদের নিজের পরিবারে প্রতিবেশে, পাড়ায় সমাজে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বা সম্মানের দাবি, শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান-অধিকারতত্ত্ব এখনো সম্পূর্ণরূপে আমাদের চরিত্রে প্রবেশ করতে পারেনি।'

ঔপনিবেশিকতার প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার। ঔপনিবেশিক প্রভুর প্রতি বিশ্বাস যেন কিছুতেই যেতে চায় না। ২৮ জুলাই ১৯৩৬ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি আজ যা লিখছি, এবং আমাদের রাষ্ট্রসভায় ভারত শাসননীতি সম্বন্ধে অধীন জাতির বক্তব্য যে পরিমাণ স্বাধীনতার সঙ্গে আলোচিত হয়ে থাকে, পাশ্চাত্য শাসিত অন্য কোনো দেশেই তা সম্ভবপর হতো না। এখানে সীডিশনের সীমা যেখানে আরম্ভ অন্যত্র সেটা তার অনেক পশ্চাতে সে কথা ভুলে থাকি বলে উষ্মাপ্রকাশের সময় আমাদের বিভ্রম জন্মায় যে জোরটা আমাদেরই; জোরটা যে অপর পক্ষে ধৈর্য এবং পৌরুষে সেটা আমাদের মনে চাপা থাকে।'

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনের চিরন্তনতা কামনা করেননি। উক্ত চিঠির কয়েক দিন আগে ২০ জুলাই ১৯৩৬ প্রমথ চৌধুরীকে আর এক চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের লোক কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজ জাতির প্রতি তোমার শ্রদ্ধা যদি এতই তবে ভারতে ইংরেজ

শাসনের চিরন্তনতা কামনা করো না কেন? আমার উত্তর এই, ইম্পীরিয়ালিজমের বিরাট জালে জড়িত বিদেশী রাজ্যশাসন ভারতের পক্ষে স্বভাবতই অশুভকর। এম্পায়ার বলতে যদি এক অখণ্ড কলেবর বোঝাত তা হলে তত বেশি ভাবনার কারণ থাকত না। গোয়ালঘর গয়লার এক গৃহস্থালিতে থাকতে পারে কিন্তু গয়লার আত্মীয় পরিবারের সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না। তার মূল্য প্রধানত দুধ জোগাবার, ভার বহন করবার। অত্যন্ত পীড়াতেও তার বাসিন্দা যদি শিং ঠেকায় তা হলে ভাঙা কপালের প্রমাণ হতে বিলম্ব হয় না। আজ শতাধিক বৎসর ইংরেজশাসনের পরেও গ্রামে গ্রামে যে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, আরোগ্য-বিধানের অভাব, পথঘাটের দুর্গতি, শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষীণতা, যে সুগভীর নিরানন্দ, তার দুর্বিষহ পরিব্যাপ্তি চোখের সামনে থেকে আমাদের হতাশ করে দিয়েছে।...

'এম্পায়ার নামধারী রাষ্ট্রিক জীবের মধ্যে সেই দ্বিখণ্ডতা জুড়িত যার ভিতর দিয়ে সজীব দেহের স্নায়ুর যোগ নেই, যোগ আছে শাসনবন্ধনের। এই অস্বাভাবিক সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ইংরেজ কর্তারা আপন মহত্ত্বকে খর্ব না করে পারে না।'

১৬ জানুয়ারি ২০০৪

য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পরশে বাঙালির জাগরণ

১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠে 'সোনার কাঠি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'বিদেশের সোনার কাঠি যে-জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়, সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব, গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সংগে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

'সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-মনের সঙ্গে আর্য-মনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা-সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্য তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্যকালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকারবিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম; তারা জানে না,

নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়, কারণ বৃহত্তরে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

'সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবনলাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ঠেকবার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে; কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে, তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চলতে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না, তাহলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

'আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচেছে, কিন্তু সংগীতে পৌঁছয় নি। সেইজন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরী করছে।'

নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে বাঙালি চরিত্রে তার কথা উল্লেখ করে ১৩২৬ সালে *জাপান-যাত্রী*তে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমি যখন জাপানে ছিলুম তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেছে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালির সঙ্গে জাপানির এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ করেছে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালির মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেছে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার পরে, বাঙালি ভারতের যে প্রান্তে বাস করে সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডববর্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে অথবা অন্য যে কারণেই হোক আচারভ্রষ্ট হয়ে নিতান্ত একঘরে হয়েছিল, তাতে করে তা একটা সংকীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল; এই কারণেই বাঙালির চিত্ত অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে যত সহজ হয়েছিল এমন ভারতবর্ষের অন্য কোন দেশের পক্ষে হয়নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণদীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হতো তা হলে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালি সকল দিক থেকেই তার সম্পূর্ণ আয়ত্ত করত। আজ নানা দিক থেকেই বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে, তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারে বাঙালির ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছে। বস্তুত, ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটী

অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায় তার একমাত্র কারণ, আমাদের প্রতিহত গতি। যা কিছু ইংরেজি তার দিকে বাঙালির উদবোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকলরকম সংস্কারের বাধা লংঘন করবার জন্যে বাঙালিই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল তখন বাঙালির মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠল সেটা হচ্ছে তার অনুরাগেরই বিকার।

'এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালির মনে সকলের চেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আজ আমরা সে-সকল কুটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা করছি সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এইজন্যেই সেটা এমন সুতীব্র, সেটা ব্যাধির প্রকোপের মতো পীড়ার দ্বারা এমন করে আমাদের সচেতন করে তুলেছে।

'বাঙালির মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলনধর্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হয়ে যায়। যত বড়ো বেদনাই আমাদের মনে থাক এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদঘাটনের ভার বাঙালির উপরেই পড়েছে।'

য়ুরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সাযুজ্য লক্ষ করে *জাপান-যাত্রীতে* রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর-কোথাও যদি মিল না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার মুক্তির জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পথচিহ্ন দেখতে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদঘাটন করবার কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে।'

১৩৪১ সালের মাঘ মাসে 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ'-এ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার বিশ্বায়নের কথা প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের জাগরণের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতা সর্বমানবচিত্তের সঙ্গে মানসিক দেনা-পাওনার ব্যবহার প্রশস্ত করে চলেছে।

'এক দিকে পণ্য এবং রাষ্ট্র-বিস্তারের পাশ্চাত্ত্যমানুষ এবং তার অনুবর্তীদের কঠোর শক্তিতে সমস্ত পৃথিবী অভিভূত, অন্য দিকে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই আধুনিককালে প্রধান বাহন পাশ্চাত্ত্যসংস্কৃতির অমোঘ প্রভাব বিস্তীর্ণ। বৈষয়িক

ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের আক্রমণ আমরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিরোধ করতে পারি নি, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যসংস্কৃতিকে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতই স্বীকার করে নিচ্ছি। এই স্বীকৃতি-অঙ্গীকারের স্বাভাবিক কারণ এই সংস্কৃতির বন্ধনহীনতা, চিত্তলোকে এর সর্বত্রগামিতা—নানা ধারায় এর অবাধ প্রবাহ, এর মধ্যে নিত্য-উদ্যমশীল বিকাশধর্ম নিয়ত উন্মুক্ত, কোনো দুর্গম্য কঠিন নিশ্চল সংস্কারের জালে এ পৃথিবীর কোণে কোণে স্থবিরভাবে বদ্ধ নয়, রাষ্ট্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার গৌরবকে এ ঘোষণা করেছে—সকলপ্রকার যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের অবমাননা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার জন্যে এর প্রয়াস। এই সংস্কৃতি আপন বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে বিশ্ব ও মানবলোকের সকল বিভাগভুক্ত সকল বিষয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত, সকল-কিছুই পরীক্ষা করেছে, বিশ্লেষণ সংগঠন বর্ণন করেছে, মনোবৃত্তির গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম স্থূল যতকিছু রহস্যকে অবারিত করছে। তার অক্লান্ত জিজ্ঞাসাবৃত্তি প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে নির্বিচার, তার রচনা তুচ্ছ মহৎ সকল ক্ষেত্রেই উপাদানসংগ্রহ নিপুণ। এই বিরাট সাধনা আপন বেগবান প্রশস্ত গতির দ্বারাই আপন ভাষা ও ভঙ্গীকে যথাযথ, অত্যুক্তিবিহীন, এবং কৃত্রিমতার জঞ্জাল বিমুক্ত করে তোলে।

'এই সংস্কৃতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন হয়ে উঠল। এ নিয়ে বাঙালি যথার্থই গৌরব করতে পারে।'

১৩৪৬ সালে 'মহাজাতি সদন'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমার বিশ্বাস য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানা দিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্বযুগের অজগর নিদ্রা থেকে।...

'আচার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবন সঞ্চারে, সাহিত্যে দেখা দিতে লাগল অদ্ভুতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতালাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণচক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হল। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকার প্রভুত্ব কাটিয়ে, কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার করে, নতুন প্রকাশের অভিসারে চলেছে...

'যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নবযুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায়নি—বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই তার সত্য পরিচয়। এ কথা কারো অগোচর নেই যে, একদা রাষ্ট্র মুক্তিসাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল

এই বাংলাদেশ এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারাপ্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধবন্ধনের মুখে যেমন নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে কখনোই এরকম ঘটে নি।...

'আমরা বাংলাজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয়-কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতি সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতি কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন এখানে নিয়ে আসুক আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক। বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়তপরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের দিকে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব।'

নিজেদেরকে 'বাংলাজাতি' বলে উল্লেখ করলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো কল্পনাতেও ভারত হতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা জাতির কথা চিন্তা করেননি। উক্ত 'মহাজাতি সদনে' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক—এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক্—

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক—সত্য হউক—সত্য হউক হে ভগবান!
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক—এক হউক—এক হউক হে ভগবান!

'সেই সঙ্গে এ কথা যোগ করা হোক—বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।'

২ জানুয়ারি ২০০৪

বাঙালির আত্মসমালোচনা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা

পরসংঘাতের বেদনায় আমাদের আত্মসমালোচনার সূত্রপাত। আত্মসমালোচনাই কি আমাদের শেষ কর্তব্য?

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ সালে 'প্রসঙ্গকথা'-য় বলেন, 'কবুল করিতে হইবে আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সে জন্য আমরা লজ্জিত অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য-বশত লজ্জাবোধও আমাদের নাই, কিন্তু সেই অপরাধখণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়লোকদের ওপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামিশ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। নালিশ করিবার লোক ঢের আছে এবং বাঙালির নামে নালিশ শুনিবার লোকও রাজপুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে।'

১৩১৩ সালের ফাল্গুনে 'সাহিত্যসম্মেলন'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের এমন সময় আসিয়াছে যখন নানা পীড়নে নানা তাড়নায় আমরা পরসংঘাতের বেদনা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না—এরূপ অবস্থা ব্যাধির অবস্থা। এমন অবস্থায় আমাদের প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু পরজাত বেদনা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া নিজের মধ্যে আমরা যদি শান্তি ও প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে চাই, যদি নানা দুর্যোগের মধ্যেও আশার ধ্রুবতারাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া আমরা বরলাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই সাহিত্যের সম্মিলনই তাহার উপায়।

'যেখানে বেদনা সেইখানেই স্বভাবতই বারংবার হাত পড়ে বটে, কিন্তু ব্যথাকে বারংবার স্পর্শ দ্বারা ব্যথিততর করিয়া তোলাই আরোগ্যের উপায় নহে। সেই বিশেষ বেদনাকে ভুলিয়া সমস্ত দেহের আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন প্রয়োগ

করিলে যথাসময়ে এই বেদনা ক্ষীণ হইয়া আসে। আমাদিগকেও এইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে, দিনরাত্রি কেবল অসুখের প্রতি সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না। যেখানে আমাদের বল যেখানে আমাদের গৌরব, সেখানেই সর্বপ্রযত্নে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলে তবেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্য সঞ্চার হইতে থাকিবে।'

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বললেন, 'বেদনা সম্বন্ধে সংজ্ঞা না থাকা যেমন রোগের চরম অবস্থা তেমনি যখন হীনতার লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমাদের চেতনাই থাকে না তখনই বুঝিতে হইবে, দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির এই লজ্জাহীনতাই চরম লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশের অসাড়তার ছোটোবড়ো প্রমাণ সর্বত্রই দেখিতে পাই। বাঙালি হইয়া বাঙালিকে, পিতাভ্রাতা-আত্মীয়-স্বজনকে, ইংরেজিতে পত্র লেখা যে কতবড়ো লাঞ্ছনা তাহা আমরা অনুভব মাত্র করি না...।

'...আমরা আজ অন্তত বিশ-পঁচিশ বৎসর পরের সিংহদ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নিষ্ফল যাত্রা করিয়া নিজেকে দেশহিতৈষী বলিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি, অথচ দেশের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাই না, ইহাও একটা অজ্ঞানকৃত প্রহসন। দেশের বিবরণ জানিতে—তাহার ভাষা ভূগোল ইতিবৃত্ত জীবজন্তু উদ্ভিদ মনুষ্য, তাহার কথাকাহিনী ধর্মসাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য স্বচেষ্টায় উদ্‌ঘাটন করিতে লেশমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল অনুভব করি না। যে দেশকে আক্রমণ করিতে হইবে সে দেশের সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করা শত্রুপক্ষের কত আবশ্যক তাহা আমরা জানি; আর, যে দেশের হিতসাধন করিতে হইবে সেই দেশকেই কি জানার কোনো প্রয়োজন নাই?

'কিন্তু প্রয়োজনের কথা কেন তুলিব? যাঁহারা দেশ শাসন করেন তাঁহারা প্রয়োজনের গরজে দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, আর যাঁহারা দেশকে ভালোবাসেন বলিয়া থাকেন তাঁহাদের কি ভালোবাসার গরজ নাই? তাঁহারা কি দেশের অন্তঃপুরে নিজে প্রবেশ করিবেন না?'

মাসখানেক পর 'সাহিত্যপরিষৎ'-এ রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'দেশকে ভালোবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা, এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোনো দেশে উল্লেখ মাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীতে অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, জানিতেছে। না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়, এই জানিবার চর্চাই ভালোবাসার চর্চা। দেশের ছোটোবড়ো সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নহিলে দেশহিত সম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে সকল বড়ো বড়ো কথা বার্কমেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি সেগুলো বড়োই বেসুরো শোনায়।'

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে শুধু সমালোচনা করে ক্ষান্ত দেননি, বরং নানা প্রসঙ্গে দৈন্যদশা থেকে বাঙালির পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন।

১৩২১ সালের ভাদ্রে বাঙালির তথা দেশের উন্নতিকল্পে 'লোকহিত'-এ শিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ জমিদারের, মহাজনের, রাজপুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষা রাখিতেছে; ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণকে নামাইয়া দিয়াছে। আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি—নিম্নতনদের সহিত ন্যায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপর পক্ষের শক্তির 'পরে নহে—এই নিরন্তন সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। সেই শক্তি দিতে গেলেই তাহাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হইবে যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো।'

ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বললেন, 'রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা, তাহাদের যোগের রাস্তা খুলিয়া না দেয়, তবে দয়ালু লোকের নাইট স্কুল খোলা অশ্রুবর্ষণ করিয়া অগ্নিদাহ-নিবারণের চেষ্টার মতো হইবে। কারণ, এই লিখিতে পড়িতে শেখা তখনই যথার্থভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহা দেশের মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে। সোনার আঙটি কড়ে আঙুলের মাপে হইলেও চলে, কিন্তু একটা কাপড় সেই মাপের হইলে তাহা ঠাট্টার পক্ষেও নেহাৎ ছোটো হয়—দেহটাকে এক আবরণে আবৃত করিতে পারিলেই তবে তাহা কাজে দেখে। সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখা দুই-চারজনের মধ্যে বদ্ধ হইলে তাহা দামি জিনিষ হয় না, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।'

১৩২৪ সালের ভাদ্রে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ এই আস্থা ব্যক্ত করেন, 'বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধার করা বার্ধক্যের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাস বৃক্ষের অমৃতফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক।'

১৩৩১ সালে ছাত্রগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অভিনন্দন সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, ...বাংলাদেশে নতুন একটা ভাব গ্রহণ করবার সাহস ও শক্তি আছে এবং আমরা

তা বুঝিও সহজে। কেননা অভ্যাসের জড়তার বাধা আমরা পাই না। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নতুন ভাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে বুদ্ধির দিক থেকে বাধা থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু জড় অভ্যাসের বাধা পাওয়া বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই জড় অভ্যাসের বাধা অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে কম বলে আমি মনে করি।'

১৯৩৯ সালে 'দেশনায়ক'-এ ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত-কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত করে তুলবে—এই চাই। আপন পরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ; এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই—বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে।'

ওই প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্রের ইতিবাচক দিকের প্রতি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে।... বাঙালির স্বভাব যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই-সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির দুর্দশার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এক শক্তিমান পুরুষের নেতৃত্ব কামনা করেন। তাঁর কাছে সুভাষ চন্দ্র বসুই ছিলেন সেই শক্তিমান পুরুষ। উক্ত 'দেশনায়ক' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে জীর্ণ দেহে রোগের মতো তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্দ্ধে তুলে ধরে মান বাঁচাতে হবে তখনই সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল করে তোলে।

'বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।'

২০ মে ১৯৩৯ অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার একটা ইঙ্গিত দেন, 'গণদেবতার পূজা সকল পূজার আরম্ভে, আমাদের শাস্ত্র এই কথা বলে। স্বদেশসেবায় সেই প্রথম পূজার পদ্ধতি হচ্ছে এমন সকল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া যাতে জনগণ সুস্থ হয়, সবল হয়, শিক্ষিত হয়, আনন্দিত হয়, আত্মসম্মানে দীক্ষিত হয়, সুন্দরকে নির্মলকে আবাহন করে আনে আপন প্রাত্যহিক জীবিকার ক্ষেত্রে, এবং যাতে আত্মরক্ষায় আত্মকল্যাণসাধনে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে সকলে সম্মিলিত হতে পারে।

'...আমি জানি দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।'

১২ মার্চ ২০০৪

পরিশিষ্ট

পাঠকের মতামত

প্রথম আলোর 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে 'একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা' ধারাবাহিকভাবে ছাপা হওয়ার সময় 'প্রতিক্রিয়া' বিভাগে তিনজন পাঠকের মতামত প্রকাশিত হয়। পাঠকের সেই মত এখানে মুদ্রিত হল।

রবীন্দ্রনাথ কেন ভারতীয় বাঙালি

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যত আলোচনা এবং গবেষণা হয়েছে, অন্য কোনো বাঙালি কবি-সাহিত্যিককে নিয়ে তা হয় নি। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যা স্থান, তাতে না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব আলোচনা এবং গবেষণা সব সময় যে উঁচুমানের, তা হলফ করে বলা যায় না। বেশির ভাগ আলোচনাই প্রশস্তিসূচক। এবং বেশির ভাগ গবেষণাই ওপর-ওপর। তথ্যমূলক। তথ্যের বিশ্লেষণ তেমন হয় নি, বা এখনো হচ্ছে না। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বৈকি! মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা' তেমন একটি গবেষণা। তিনি যেভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছেন এবং থিম ধরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে প্রকাশ করছেন, তা নির্ভেজাল প্রশংসায় দাবিদার। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিশাল রচনাবলী দেখে ভয় পান এবং পড়েন না, বা পড়ার সময় পান না, অথচ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মোটামুটি আগ্রহী মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সত্যি বলতে কি, কেবল সার্টিফিকেট অর্জন করে তো শিক্ষিত হওয়া যায় না। সত্যিকারের শিক্ষিত হওয়ার জন্য বৈদগ্ধ্য অর্জন করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাটাকে হীরের টুকরো এবং হীরের দ্যুতিটাকে বৈদগ্ধ্য বলে

উল্লেখ করেছেন। দ্যুতিহীন হীরে কি হীরে? বস্তুত, আমাদের ভাষা এবং চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে মিশে আছেন যে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমরা তাঁরই ভাষায় কথা বলি, লিখি, তাঁরই ভাষায় চিন্তা করি। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন আনমনা পথ চলতে গিয়ে আমরা ফুলের কথা ভুলে যাই, তারার কথা ভুলে যাই, কিন্তু তবুও তারা প্রাণের নিশ্বাসবায়ু সুমধুর করে। রবীন্দ্রনাথও আমাদের চেতনাকে জুড়ে আছেন। চেতনাকে পরিশীলিত করেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেন, তাঁরাও তাঁর ভাষা ধার করেই তা করেন। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা সজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণ করেন। অনেকে রাবীন্দ্রিক আদর্শ অনুসরণ করে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। কাজেই যাঁরা রবীন্দ্রনাথ না-পড়েও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিতে চান, তাঁদের জন্য মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের গবেষণা এবং লেখা খুবই অমূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

আমার শুধু একটাই খটকা লাগে। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথের পরিচয় শুধু বাঙালি দিলে সেটা কি খুবই বিকৃত পরিচয় হতো? রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বাঙালি কি করে হলেন, আমার সেটা ঠিক বোধগম্য নয়। ভদ্রলোক মারা যান ১৯৪১ সালে। তখন তো ইচ্ছে করলেও বাংলাদেশী বাঙালি অথবা শুদ্ধ বাংলাদেশী হওয়ার উপায় ছিল না! কেবল তাই নয়, আমার কথা হচ্ছে, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান যখন এত পরিশ্রম এবং সময় দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে সাধারণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তখন একটা 'ভারতীয়' দেয়াল তুলে তাঁকে দেয়ালের ওধারে না রাখলেই কি ভালো হতো না! রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ দাশ এঁদের যদি তাবৎ বাংলাভাষী সব সীমান্তের বাধা অগ্রাহ্য করে নিজেদের লোক বলে শনাক্ত করতে না পারেন, তা হলে আর কাকে পারবেন? মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের একজন অতি পরিশীলিত গদ্যলেখক। তাঁর লেখা পাঠকদের ভাবায়। তাঁর গদ্য সাবলীল এবং সুললিত। কিন্তু তাঁর বাঙালি পরিচয় যে রাজনীতি দিয়ে চিহ্নিত, তা দেখে খানিকটা দুঃখিত না হয়ে পারছিনে।

গোলাম মুরশিদ
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

বাঙালি রবীন্দ্রনাথ

১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ *প্রথম আলোর* 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে প্রকাশিত গোলাম মুরশিদ রচিত 'রবীন্দ্রনাথ কেন ভারতীয় বাঙালি?' শীর্ষক প্রতিক্রিয়ার

সঙ্গে কিছু বক্তব্য যুক্ত করতে চাই। গোলাম মুরশিদ প্রবাসে থেকেও তার প্রাজ্ঞ উপস্থাপনায় নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন। বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বাঙালিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি লিখেন, লিখছেন। 'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'র 'দিগদিগন্তর'-এ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বরাবরের মতোই চমৎকার উপস্থাপনায় 'একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা' উপস্থাপন করছেন। রবীন্দ্রনাথ কেন ভারতীয় বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন সে সম্পর্কে আমি আগস্ট মাসে একটি প্রতিক্রিয়া পাঠাই প্রথম আলোর দপ্তরে। কিন্তু আমার প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশিত হয় নি। যা হোক, ১৬ অক্টোবর ২০০৩ রাজশাহী যাওয়ার সময় বিমানে সহযাত্রী হিসেবে পেলাম বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে নানা কথা বলার ফাঁকে আমর প্রেরিতে প্রতিক্রিয়াটি সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তিনি অবাক হলেন এবং বললেন, 'প্রতিক্রিয়া যা-ই হোক তা ছাপানো উচিত। এরপর আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'তাহলে রবীন্দ্রনাথকে কি বাংলাদেশী বাঙালি বলব?' আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশী নন ও ভারতীয় বাঙালিও নন, তিনি বাঙালি। ১৯৪৭-পূর্ব সময়ে যার মৃত্যু হয়েছে তাঁকে ব্রিটিশ ভারতীয় বলা যেতে পারে, তবে ভারতীয় বলা আমি মেনে নিতে পারছি না। এর উত্তরে বিচারপতি হাবিবুর রহমান বললেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কখনো বাঙালি বলেন নি। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিলাম। ৩০ মিনিট সময় কখন কেটে যায়। রাজশাহী এসে গেল। বিদায় সম্ভাষণ নিয়ে যার যার গন্তব্যে গেলাম। বাঙালির জীবন, বাঙালির সংস্কৃতি, বাংলার নদী প্রভৃতি যে কবির লেখায় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তাতে তাকে কি শুধু বাঙালি বলাই যথেষ্ট নয়?

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী', প্রথম আলো : ২ জানুয়ারি ২০০৪

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বাঙালিই

'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী'তে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'দিগদিগন্ত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'একজন ভারতীয় বাঙালির আত্মসমালোচনা' প্রসঙ্গে ১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ প্রকাশিত এক প্রতিক্রিয়ায় জনাব গোলাম মুরশিদ প্রশ্ন তুলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কেন ভারতীয় বাঙালি? ২ জানুয়ারি ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়ার প্রকাশিত এক প্রতিক্রিয়ায় একই প্রশ্ন দেখা গেল।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বাঙালি। রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষণজন্মা ও প্রতিভাবান মানুষ যে সময়ে, যে স্থানে ও যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়, স্থান ও সমাজ চিরকাল তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার কথা বলবে। আমরা গর্বিত, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ছিলেন।

যে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ছিলেন তাঁর বাঙালিত্ব নিয়ে আমরা গর্ববোধ করতে পারি, কিন্তু তৎকালীন ভৌগোলিক সীমারেখা বিবেচনায় ও বৃহত্তর চেতনায় যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, তাঁর সেই জাতীয়তা প্রকাশে বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মনেপ্রাণে শুদ্ধ ও অখণ্ড ভারতকামী ভারতীয়। জনাব গোলাম মুরশিদ তাঁর পত্রের এক জায়গায় লিখেছেন, 'ভদ্রলোক (রবীন্দ্রনাথ) মারা যান ১৯৪১ সালে। তখন তো ইচ্ছে করলেও বাংলাদেশী বাঙালি অথবা শুদ্ধ বাংলাদেশী হওয়ার উপায় ছিল না।' ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল বা স্বাধীনতা-উত্তরকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কিংবা তার চেয়েও বেশি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আয়ু পেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারতীয় পরিচয় মুছে ফেলে শুদ্ধ বাংলাদেশী হয়ে যেতেন? কোনোভাবেই না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতিগত পরিচয় বাঙালি ও জাতীয়তা 'ভারতীয়'র কোনোটাকে কোনোটার চেয়ে খাটো করে দেখেন নি। বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতা-পরবর্তী মানসিকতা কী হতো, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না পাওয়া গেলেও বর্তমান বিচারে তিনি ভারতের ভূখণ্ডে জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেছেন, এই হেতুও রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় বাঙালি বলাটাই সমীচীন। গোলাম মুরশিদ আরো লিখেছেন, একটা 'ভারতীয়' দেয়াল তুলে রবীন্দ্রনাথকে দেয়ালের ওধারে না রাখলেই কি ভালো হতো না? রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীয় বাঙালি' হলে তবে কি তিনি আর আমাদের থাকেন না? নিশ্চয়ই থাকেন। আমাদের কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি বাঙালি, তিনি বাংলা সাহিত্যের কবি। আবার তিনি ভারতীয় বাঙালিও।

জনাব গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া এক প্রতিক্রিয়ায় বিমানে জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে তার আলোচনার যে অংশ উল্লেখ করেছেন পত্রে, তাতে তিনি জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশীও নন, ভারতীয় বাঙালিও নন, তিনি বাঙালি।' এতে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু পরিচয় ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ কেবলই কি তাঁর জাতিগত পরিচয়ে পরিচিত হবেন? তাঁর জাতীয়তা উল্লেখ করা যাবে না? রবীন্দ্রনাথ একজন ভারতীয়, ভারতীয় বাঙালি, বাংলা ভাষার কবি, আমাদের কবি, আমাদেরই কবি। এ গেল আমার কথা, আমার ব্যক্তিগত বিবেচনা। 'একজন ভারতীয় বাঙালির

আত্মসমালোচনা'র লেখক জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হয়তো অন্য কোনো গূঢ় কারণে তাঁর রচনার শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ভারতীয় বাঙালি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এই আখ্যার ব্যাখ্যা কেবল তাঁর লেখা থেকেই পাওয়া সম্ভব।

কয়েছ আহমদ বকুল
আবুধাবি
সংযুক্ত আরব আমিরাত

'শুক্রবারের সাহিত্য সাময়িকী', দৈনিক *প্রথম আলো* : ২৩ জানুয়ারি ২০০৪

নির্ঘণ্ট

[বাঁকানো হরফে গ্রন্থের নাম এবং ঊর্ধ্ব কমা দ্বারা প্রবন্ধ/বক্তৃতা/কবিতার নাম চিহ্নিত করা হল]

অনাথনাথ বসু ১০৮
'অপমানের প্রতিকার' (১৩০১) ৮৮
'অবতরণিকা' (*রবীন্দ্র রচনাবলী*) ১৬
অমিয় চক্রবর্তী ৬১, ৭৩, ৯১, ১১৫, ১৩৩
অমিয় চৌধুরী ৬২

'আচারের অত্যাচার' (১২৯৯) ৪৩
আত্মশক্তি ও সমূহ (১৩১৩) ৭২
'আলস্য ও সাহিত্য' (১২৯৪) ৯২
আলোচনা ১৮
'আশ্রমের শিক্ষা' (১৩৪৩) ৮৯

'ইংল্যান্ডের ভাবুক সমাজ' (১৩১৯) ৮৮
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ১৭, ১৮, ৩১, ৫৮, ৮০, ৮১, ৮২

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪) ৪৯, ১২১, ১৩১
'কর্মযোগ' ৯৬
কালান্তর (১৩৪০) ৫২, ১২২
'কৃপণতা' (১৩২২) ২৬
'কেন' ১৯

'খেলা ও কাজ' (১৩১৯) ৩৮, ১১৯
'গান্ধীজী' (১৩৩৮) ১২১
গোখলে ১১৪

চিঠিপত্র ২০, ২৪, ৭০

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) ৯৯

'জলোৎসর্গ' (১৩৪৩) ১৬
জাপান-যাত্রী (১৯২৩) ৩২, ১২৫, ১২৬

তিন সঙ্গী ২৪
তেজেশচন্দ্র সেন ১১৬

দীনেশচন্দ্র সেন ৮২
'দেশনায়ক' (১৩০১) ৭২, ৮৮, ১৩২

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৪৯

'নরনারী' ২৩
'নামের পদবী' (১৩৩৮) ৩৬
'নূতন ও পুরাতন' ১৫
'ন্যাশনাল ফণ্ড' (১২৯০) ১০৪

পঞ্চভূত (১৩০৪) ২৩
পথ ও পাথেয় (১৩১৫) ৫৮
পথের সঞ্চয় (১৩১৯) ৩৮, ৪০, ৫৪, ৫৭, ৬০, ১০৬, ১১৯
পল্লী প্রকৃতি (১৩৩৭) ৫২, ৫৩
'পল্লীর উন্নতি' ৬৩, ১০৭
'পল্লীসেবা' ১১০, ১১১
পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি (১৯২৪) ২৩, ৬১, ১০৭
পারস্য (১৯৩২) ৩৩
প্রমথ চৌধুরী ৭৩, ৮১, ৮৩, ১২২
'প্রাঞ্জলতা' ৮২
'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১২৯৮) ৬৪, ৮৬, ৯২

বঙ্গভঙ্গ ৭৫
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৩০৯) ৭৫
'বঙ্গমাতা' ২২
বঙ্গমাতার হেমন্তাস ও বাঙালি পুরুষ ২২-২৫
'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' (১৩০১) ৮৬

বাংলা ভাষা-পরিচয় (১৯৩৮) ৮৪, ১০৩
'বাংলা লেখক' (১২৯৯) ৯৭
'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' (১৩৪১) ৭২, ১২৬
বাঙালির আত্মসমালোচনা ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ১২৯-১৩৩
বাঙালির আত্মাভিমান ও আধ্যাত্মিকতার অহঙ্কার ৯২-১০২
বাঙালির আদবকায়দা ৩৬-৪২
বাঙালির ঈর্ষাপরায়ণতা ১২১
বাঙালির কাজের ধারা ৬৪-৬৯
'বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত' (১৩৩৮) ৫৩, ৯০
বাঙালির খাওয়া-পরা ও অবাধ সামাজিকতা ৩১-৩৫
বাঙালির জীবনে পরাধীনতা ১১৯-১২৩
বাঙালির দারিদ্র্য ৫৩-৫৪
বাঙালির দলাদলি ৭০-৭৪
বাঙালির দৈন্যদুর্বলতা ৫৮-৬৩
বাঙালির নকলনৈপুণ্য ১০৮
বাঙালির পরিবারতন্ত্র ২৬-৩০
বাঙালির বাঁধা রীতির বন্ধন ৪৩-৫২
বাঙালির ভাবভাষার দৈন্য ৮০-৮৫
বাঙালির ভাবপ্রবণতা ৭৫-৭৯
বাঙালির মুখস্থবিদ্যা ১১১-১১২
বাঙালির শিক্ষাদীক্ষা ১০৩-১১৮
'বিদ্যার যাচাই' ১০৮
'বিদ্যাসাগরচরিত' (১৩০২) ৬৪, ৮৮
'বোম্বাই শহর' (১৩১৯) ৩৩, ৫৪
'ব্যাধি ও প্রতিকার' (১৩১৪) ৬৬, ৯৪

'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' (১৩৩২) ২৯, ৫০
'ভাষার কথা' ১০৩

মঙ্গলকাব্য ৮৩
মমিজম ২৫
'মহাজাতি সদন' (১৩৪৬) ১২৭
মুহম্মদ এনামুল হক ৮৪
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৮৪, ১১৮
'মেঘনাদবধ কাব্য' (১২৮৪) ১০৪

'যাত্রার পূর্বপত্র' ৫৭, ৬০

য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ৮৬, ১০৪
য়ুরোপীয় সংস্কৃতির পরশে বাঙালির জাগরণ ১২৪-১২৮

'রাজা ও প্রজা' ১১৯
রাজাপ্রজা (১৩৩০) ৬৯, ৭০
রামমোহন রায় ৮১
রাশিয়ার চিঠি ২৫, ৩১, ১২১

'লক্ষ্য ও শিক্ষা' ১০৬
'লোকহিত' (১৩২১) ১৩১
'ল্যাবরেটরি' ২৪

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৯
'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' (১৩৪২) ১১১
'শিক্ষাবিধি' ১০৬
'শিক্ষা সংস্কার' (১৩১৩) ১০৯
'শিক্ষার বাহন' (১৩২২) ১১০
'শিক্ষার বিকিরণ' ৮৪, ১১২
'শিক্ষার মিলন' (১৩২৮) ১০০, ১০৯
'শিক্ষাসমস্যা' (১৩১৩) ১০৫
'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৯৩৬) ৩২, ১১৩
শ্রী নবীন কিশোর শর্মণঃ ২০, ২৪, ৭০
শ্রী দিলিপকুমার রায় ৪৯, ৭৮

'সঞ্জীবচন্দ্র' (১৩০১) ৮৬
'সদুপায়' (১৩১৫) ১০৩
'সমবায়-২' (১৩২৯) ৫৫
'সমাজভেদ' (১৩১৯) ৩৮, ৪০
'সমুদ্র যাত্রা' (১২৯৯) ৪৪
'সাহিত্য পরিষৎ' (১৩১৩) ২০, ৬৬, ৭২, ১৩০
'সাহিত্য বিচার' (১৩৪৭) ১৭, ৫২, ৭৩
'সাহিত্য সম্মেলন' (১৩১৩) ৬৫, ১২৯
'সাহিত্যে নবত্ব' (১৯২৭) ৫৬
সাহিত্যের পথে (১৯২৭) ৫৬
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫১, ৮৪
'সোনার কাঠি' (১৩২২) ১২৪
'স্নেহগ্রাস' ২২
স্বদেশ (১২৯৮) ১৫, ১৮
'স্বদেশী সমাজ' (১৩১১) ৭১
'স্বরাজসাধন' (১৩৩২) ৮৯
'স্বাতন্ত্র্যসাধন' (১৩২২) ১০৮

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮৪
'হিন্দুবিবাহ' (১৯২৪) ৬৪

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET